পরম বিস্ময় বালক ঠাকুর

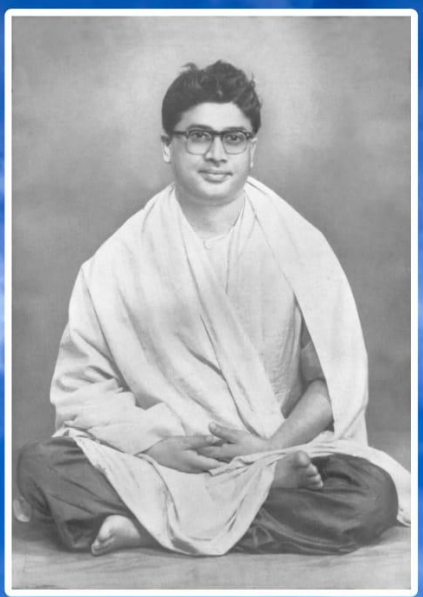

রাম নারায়ণ রাম

পরম বিস্ময় বালক ঠাকুর

দ্বিতীয় পর্ব

(ঢাকা পর্ব)

সূচীপত্র

১। ভোলা গিরি – আনন্দময়ী মা – রামঠাকুর – মান্না মিঞার বাবা – টি. বি. রোগীর আরোগ্যলাভ – সন্ন্যাসীর গৃহে প্রত্যাবর্তন – হেডমাস্টার মহেন্দ্রবাবু।

২। যুবকের স্মরণীয় ঘটনা – রোগ উপশম – দীক্ষায় অভিজ্ঞতা – অণিমা – প্রাকাম্য – রহস্যময় সাধক।

৩। কলিকাতা পরিক্রমা – বিভিন্ন অভিজ্ঞতা – তত্ত্বলিপি।

৪। নৌবাহিনীর অফিসার – ভক্তের ধ্যান – অন্ধকে দৃষ্টিদান – দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় – তস্করের পরিবর্তন - অণিমা – প্রাকাম্য – তত্ত্বালাপ।

৫। পাহাড় পরিক্রমা – তত্ত্ব – ষড়যন্ত্র – অণিমা প্রভৃতি বিভূতি – স্বামীবাগে নিজস্ববাড়ি - দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়।

৬। প্রাকাম্য – বলধার জমিদারের দীক্ষা – তত্ত্বালাপ – বৃদ্ধার সমস্যার সমাধান – বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ভক্তদের সমস্যার সমাধান – উন্মাদিনী স্ত্রীলোক - দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় – তত্ত্বালাপ – উন্মাদের আরোগ্যলাভ – অশ্বিনী চ্যাটার্জী।

৭। অপূর্ব বিভূতি - দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় – খ্যাতনামা বিজ্ঞানী – অশ্বিনী চ্যাটার্জীর মৃত্যু – নেতাজী সম্পর্কে – অপবাদই প্রচারের বাহন।

৮। শিশুর অদ্ভুত আরোগ্যলাভ – যুবকের অভিজ্ঞতা – প্রাকাম্য – যুবকের বিপন্মুক্তি – কীর্তনে অদ্ভুত ঘটনা – অণিমা – বিভূতি।

৯। যুবকের বিপন্মুক্তি – রহস্যময় ঘটনা – ভগ্নির বিবাহ – দিদিমার মৃত্যু।

১০। ভক্তের প্রতীক্ষায় – ভারত বিভাগ – পূর্ববঙ্গ ত্যাগের সিদ্ধান্ত – তত্ত্বালাপ।

দ্বিতীয় পর্ব

[ঢাকা]

ঢাকা শহর ঠাকুরের কাছে অপরিচিত নয় - এই শহরেই স্বামীবাগে তাঁর মামার বাড়ি এবং টোল। সুতরাং প্রতি বছরেই একবার দু'বার তাঁর ঢাকা আসা পড়ে এবং সেই সময়ে শিষ্য, ভক্ত, অনুরাগীদের দর্শন দিতে হয়। এই শহরেই শিশু বয়সে বিখ্যাত সাধক ভোলা গিরির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তখন ঠাকুরের বয়স সাত কি আট। মামাবাড়িতে এলে প্রায়ই তিনি ভোলা গিরি আশ্রমের বাঁধানো পুষ্করিণীতে স্নান করতে যান, আশ্রম প্রাঙ্গণে বিকালে বেড়াতেও যান। সেবার ভোলা গিরি আশ্রমে এসেছেন কয়েকদিন হ'ল। ঠাকুরও তাঁর অভ্যাসমত পুষ্করিণীতে স্নান করে একটা গামছা পরে, একটা গামছা গায়ে দিয়ে, খড়ম পায়ে বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন, হাতে রয়েছে করঙ্গ - এমন সময় তাঁর উপর ভোলা গিরির দৃষ্টি পড়লো। নিকটেই আমগাছের তলায় একটা বাঁধানো বেদীতে শিষ্যপরিবৃত হয়ে বসেছিলেন ভোলা গিরি। ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি পড়াতে হঠাৎ তিনি উঠে পুষ্করিণীর দিকে এগিয়ে গেলেন। শিষ্যভক্তেরা আশ্চর্য হয়ে দেখছে, তাদের গুরু মহারাজ কি করছেন! ভোলা গিরি এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরকে জড়িয়ে ধরলেন, ভক্তি গদগদ ভাবে বললেন, "ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ মিল গেয়ি। মেরা জনম্ সার্থক হুই।" ঠাকুর পরম করুণাভরে তাকালেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। ভোলা গিরির শিষ্যবর্গ শিশুঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো। আশ্রমের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক জমিদার যোগেশ রায় তাঁর অধ্যাপক হেরম্বনাথ তর্কতীর্থের ভাগিনেয় এই শিশুঠাকুরকে সেদিন নতুন করে চিনতে চেষ্টা করলেন। টোলের বাইরে শিশুঠাকুরকে তিনি আগেও দেখেছেন, কিন্তু তখন তো তিনি এইভাবে তাঁকে দেখেননি! স্

এই ভোলা গিরি আশ্রমেই খ্যাতনামা সাধিকা 'আনন্দময়ী মা'য়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় - ঠাকুরের বয়স তখন ষোল-সতের বছর। আনন্দময়ী মায়ের প্রিয় শিষ্য জ্যোতিষ রায়ের একমাত্র পুত্র

রামানন্দ রায় মরণাপন্ন - ডাক্তারেরা জবাব দিয়েছে। জ্যোতিষ রায়ের স্ত্রী মণিকুন্তলা রায় সব চেষ্টা শেষ করে পরিশেষে ঠাকুরের শরণাপন্ন হলেন। ঠাকুরের কৃপাস্পর্শে রামানন্দ রায় সাতদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলো। রামানন্দের আরোগ্যলাভের সংবাদ পেয়ে আনন্দময়ী মা বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন, কে সেই মহাশক্তিধর পুরুষ যাঁর স্পর্শে মুমূর্ষু রোগী ভাল হয়ে উঠলো! দুই একজন ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। বাড়িতে না পেয়ে গেলেন ভোলা গিরির আশ্রমে। সেখানে ঠাকুরকে 'নারায়ণ', 'নারায়ণ' বলে আনন্দময়ী মা জড়িয়ে ধরলেন। অনেকক্ষণ তাঁদের আলাপ আলোচনা হ'ল। বিদায় নেবার সময় বললেন, 'নারায়ণ, এবার আসি।'

আবার এই শহরেরই সীমায় একটি পয়সা বাঁচাবার জন্য কতবার যে ঢাকা ষ্টেশনে ট্রেনে না উঠে অতিকষ্টে স্লীপার দেওয়া রেলপুল পার হয়ে দোলাইগঞ্জ ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। একটি মাত্র লাইন - কখন যে ট্রেন এসে পড়ে ঠিক নেই। তার উপর আবার ফাঁক ফাঁক স্লীপার দেওয়া দোলাইগঞ্জের রেলপুল। বহু নীচে বইছে গভীর খাল। পা ফস্ কালে রক্ষা নেই। এ হেন পুলের উপর দিয়ে ঠাকুর যা'ন বোঝা হাতে করে, কারণ তাঁর কাছে তখন এক পয়সার দাম অনেক। একবার, ঠাকুরের তখন বয়স বারো কি তেরো, ট্রেন পুল পার হয়ে গেছে দোলাইগঞ্জে, সেখানে ট্রেন মাত্র কয়েক মিনিট থামে। ঐ সময়ের মধ্যে ফাঁক ফাঁক স্লীপার পেরিয়ে দোলাইগঞ্জে পৌঁছানো অসম্ভব। তবু ঠাকুর তাঁর এক ভক্তকে নিয়ে পুল পার হচ্ছেন – দুজনের হাতেই বোঝা। ভক্তটি বলছে, "ঠাকুর, তুমি ট্রেন ধরতে পারবে না।" ঠাকুর বলছেন, "আমি না গেলে ট্রেন ছাড়বে না রে, আমার যে অনেক কাজ!" ষ্টেশনে পৌঁছে দেখে তখনও ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। কামরায় উঠে ঠাকুর ভক্তটিকে বললেন, "তুই এবার নেমে যা। ট্রেন এখনই ছাড়বে।" ভক্তটি নেমে গেল। ট্রেনও ছেড়ে দিল। ভক্তটি ষ্টেশনে খবরাখবর নিয়ে বুঝল যে, কেউই জানে না কেন ট্রেনটি এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল।

এই শহরেরই সদরঘাটে রূপবাবু-রঘুবাবুদের জমিদার বাড়িতে ভক্তিপ্রেমের যে জোয়ার একদিন বইয়ে দিয়েছিলেন, সেকথা অনেকেই ভুলতে পারেনি। প্রসিদ্ধ সেতারী শ্যামবিনোদ ঘোষ

সেখানে সেতারে তান তুলে এক অদ্ভুত সুরময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। জমিদারবাড়ির সকলে সেদিন ঠাকুরের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করে ধন্য হয়েছিল।

এই ঢাকা শহরেই একদিন কয়েকজন যুবক ঠাকুরের নামে অপপ্রচার শুনে বিরুদ্ধ মনোভাব নিয়ে উপস্থিত হয়। ঠাকুরকে দেখে তাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর হ'ল। ইনি যে নিতান্তই অল্পবয়স্ক বালক! তারা বুঝতে পারলো যে, এঁর বিরুদ্ধে অপবাদ শুধু অমূলকই নয়, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইতিমধ্যে এক ভক্ত এক কলসী দুধ নিয়ে এসে উপস্থিত। ঠাকুর বললেন যে, তাঁর কাছে দুধ গরম করবার এবং ঠান্ডা করবার দুইরকম যন্ত্রই আছে - যে যেরকম খেতে চায়, তাকে সেইরকমই দেওয়া হবে। একই কলসী থেকে গ্লাসে করে প্রত্যেককে দুধ দেওয়া হচ্ছে - যে গরম দুধ চাইছে, তার দুধ এত গরম যে, গ্লাস হাতে রাখতে পারছে না। আবার যে ঠান্ডা চাইছে, তার দুধ এত ঠান্ডা যে হাতে ধরা কঠিন। তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, ঠাকুর নিতান্ত বালক হলেও মহাশক্তিধর। সুতরাং সানন্দে তাঁর শরণাপন্ন হ'ল।

ঢাকা শহর তাই ঠাকুরের কাছে নতুন নয়, ঠাকুরও ঢাকার অধিবাসীদের কাছে অপরিচিত নন। গ্রামের সহজ, সরল, স্বচ্ছতা অবশ্য শহরে আশা করা যায় না; কারণ নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষ এখানে জীবিকা অর্জনে ব্যস্ত। তাই আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাধারারই প্রাধান্য বেশি এখানে - দ্বন্দ্ব, দ্বিধা, অবিশ্বাস মানুষের মনকে বিভ্রান্ত করে তোলে।

উজানচর-কৃষ্ণনগর থেকে এসে ঢাকায় মামার বাড়ি স্বামীবাগে উঠলেন। সেখানে কয়েকদিন থেকে ভক্তশিষ্যদের আগ্রহাতিশয্যে ঘুরে ঘুরে তাদের বাড়িতে কিছুদিন করে থাকতে লাগলেন। ভক্তশিষ্যের সংখ্যা ক্রমশ:ই বাড়তে লাগলো। প্রত্যেকেরই প্রাণের ইচ্ছা যে, ঠাকুর তার বাড়িতে থাকুন। ঠাকুরও তাদের মনের দিকে তাকিয়ে যথাসম্ভব চেষ্টা করতেন যেন কেউ মনে ব্যথা না পায়। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, ঠাকুর কোথায় আছেন বার করতে দুই-তিন বাড়ি খুঁজতে হতো।

প্রচলিত নিয়মে গুরু শিষ্যদের কাছ থেকে যে দক্ষিণা পান, যে দানসামগ্রী পান, তাই দিয়েই তিনি সংসার চালান এবং যে গুরুর পাঁচশো বা হাজার শিষ্যভক্ত আছে, তাঁর বেশ সচ্ছল

অবস্থা। প্রণামী, দক্ষিণা যা পান, তাতে তাঁর সমস্ত ব্যয় সংকুলান হয়েও উদ্বৃত্ত থাকে। তাই স্বভাবত:ই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বালক ঠাকুর, যাঁর শিষ্য সংখ্যা এই অল্পবয়সেই কয়েক লক্ষ হয়ে গেছে - তাঁর এত দরিদ্র অবস্থা কেন? তার কারণ, তিনি কারও কাছ থেকে দান গ্রহণ করেন না, দীক্ষাদান করে দক্ষিণাও নেন না। অকারণ বাক্যব্যয় করতে হয় বলে, কেউ জোর করে প্রণামী দিলে তিনি যদিও প্রত্যাখ্যান করেন না, তবু শিষ্য ভক্তদের কাছ থেকে তাঁর কোনও চাহিদা নেই। কেউ মনের আবেগে যদি কিছু দেয়, তার মনের দিকে তাকিয়ে তা গ্রহণ করলেও, তিনি সেই টাকায় অনেককে সাহায্য করেন। শিশু বয়স থেকেই তিনি স্বাবলম্বী, তাই আত্মীয়স্বজন, শিষ্যভক্তদের বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন থাকলেও তিনি কোন না কোন উপায়ে সংসার খরচের বেশ কিছুটা অংশ বহন করেন। কারও বদান্যতার উপরে নির্ভর করে থাকা যে তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তাই তিনি যখন যেখানেই থাকুন না কেন, কারও বদান্যতা বা অনুগ্রহের উপর নির্ভর করেন না।

ঠাকুর ঢাকাতেই বেশির ভাগ থাকেন। মাতাপিতা তখনও কৃষ্ণনগরে আছেন, সুতরাং মাঝে মাঝে উজানচর-কৃষ্ণনগরে যান। আবার আড়াইহাজার, পালপাড়া এবং অন্যান্য স্থানেও যান। কিছুদিন পরে ঠাকুর একবার নারায়ণগঞ্জে গেলেন। রামঠাকুরও নারায়ণগঞ্জে এসেছেন। শরীর তাঁর অসুস্থ, দীর্ঘদিন আমাশয়ে ভুগে কাহিল হয়ে পড়েছেন। ডাক্তার-কবিরাজের চিকিৎসায় বিশেষ কোন ফল হচ্ছে না। কমলাপুরের বড় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার উমেশ মুখার্জীর কাছে বালক ঠাকুর সম্বন্ধে অনেক কথা তিনি শুনেছেন। রামঠাকুর মহাপ্রভুর ভক্ত; তাই মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণীর মূর্ত প্রতীক হয়ে বালক ঠাকুর এসেছেন জেনে তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনেকদিন থেকেই তাঁর বাসনা। যোগাযোগ হয়ে গেল। নারায়ণগঞ্জে ঠাকুর এসেছেন রামঠাকুর যে বাড়িতে থাকছেন তার পাশের বাড়িতে। অনেকেই বলে একমাত্র বালক ঠাকুরই পারবেন রামঠাকুরকে সুস্থ করে তুলতে। মহাপ্রভুর অবতারকে দেখতে তো তিনি ব্যাকুল! গেলেন পাশের বাড়িতে। ঠাকুরকে দেখে অভিভূত হয়ে তিনি বলে উঠলেন, "সত্যনারায়ণ, তুমি এসেছ!" ঠাকুর এই অমায়িক, নিষ্ঠাবান্ সাধকটিকে ভালবেসে ফেললেন, বললেন, "অনেক সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। আপনাকে কিন্তু আমাদের বেশ ভাল লেগেছে।" তাঁর অসুখ সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম বলে দিলেন, তাতেই রামঠাকুর সুস্থ হয়ে

উঠলেন। রামঠাকুর সাধারণত: সবাইকে 'আপনি' করে সম্বোধন করতেন। তিনি নাম দিতেন, বীজমন্ত্র দিতেন না। ঠাকুরের প্রতি তাঁর এত শ্রদ্ধা ছিল যে, পরে তিনি অনেক ভক্তকে ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিতে পাঠাতে শুরু করেন।

ঢাকাতে যদিও তখন ঠাকুরের শিষ্যভক্তের সংখ্যা খুব নগণ্য নয়, তবু তাঁকে সম্পূর্ণ একটি নতুন পরিবেশে এসে পড়তে হ'ল। তাঁর শৈশবের লীলাক্ষেত্র উজানচর-কৃষ্ণনগরে মানুষ তাঁকে শশীকলার মত বেড়ে উঠতে দেখেছে, দেখেছে তাঁর অসংখ্য বিভূতি। তবুও গ্রামের সরল জনসাধারণই তাঁকে সর্বপ্রথম চিনতে পারে, পূজা করে। বুদ্ধিজীবী সমাজের মানুষের পক্ষে সংশয়-দ্বিধা কাটিয়ে এগিয়ে আসতে একটু সময় লাগে। ঢাকা শত হলেও শহর, সেখানে যেমন জ্ঞানীগুণী মানুষ অনেক আছেন, তেমনি সাধারণ মানুষও আছে। কিন্তু শহরের তথাকথিত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব মানুষের সরলতা অপহরণ করে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, আত্মাভিমান, কপটতাকেই বড় করে তুলেছে। তার উপর আবার রয়েছে অন্যান্য গুরু মহানদের প্রতিপত্তি এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় রাজনৈতিক প্রভাব। সব মিলে একটি জটিল অবস্থা। সেখানে সাধারণ একজন ব্রাহ্মণ বংশের সন্তানের পক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ানো কষ্টসাধ্য। এখানেই বালক ঠাকুরের মহিমা। রূপ-মাধুর্যে ভরপুর হয়ে, অনন্ত প্রেম ভালবাসা নিয়ে বৈদিক কুলের এক নবীন যুবক ধীরে ধীরে ব্রিটিশ রাজত্বের রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে কী করে ফুটে উঠে স্বমহিমায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন, সেটাই পরম বিস্ময়! চরম ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে, অথচ বাস্তবের সঙ্গে মিশে পরিশ্রম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তৎকালীন বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিদের তত্ত্ব আলোচনায় মুগ্ধ করে টেনে আনতে লাগলেন। কৃষক, ক্ষেতমজুর, মধ্যবিত্ত পরিবার, মেধাবী ছাত্র, রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিদীপ্ত যুবক-যুবতী, সাধুসন্ন্যাসী সবাই তাঁর শরণাপন্ন হতে শুরু করলো। কথা বেশি বলেন না। আসনে বসলে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা পুরুষ। নানারকম মুদ্রার ভিতর দিয়ে নিজের ভাব প্রকাশ করেন। তবু মানুষ পাগলের মত তাঁর কাছে ছুটে আসে, দীক্ষা নেয়, আশ্রয় খোঁজে ।

এদিকে উজানচরে মানুষ তাঁকে না পেয়ে বিষাদগ্রস্ত। আশু সেন, ত্রৈলোক্য সোম, প্রকাশ বল, জিন্নত আলি, হাজি মিঞা, ঠাকুরের সহপাঠি, খেলার সাথী প্রভৃতি সকলেরই মন খারাপ; মান্না

মিঞার বাবা তো একেবারে মুষড়েই পড়েছেন। মান্না মিঞার বাবা বালক ঠাকুরকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন। তিনি একদিন বালককে বলেছিলেন, 'আমাকে একবার বাবা বলে ডাক।' ঠাকুরের সেই ডাকে তিনি নিজেকে ভুলে গিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ঠাকুরের অদর্শনে তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। স্মৃতিচারণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই, তাই তিনি একদিন উজানচর স্কুলে গেলেন। জানতে চাইলেন, কেন বালক পড়াশুনা শেষ না করেই লেখাপড়া ছেড়ে দিলেন। অঙ্কের মাষ্টার নিবারণবাবুর সঙ্গে অনেক কথাই হ'ল। নিবারণবাবু বললেন যে, শেষমুহুর্তে তিনি জানতে পারেন যে, আর্থিক অনটনই তাঁর লেখাপড়া করার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল; অথচ ছাত্র হিসাবে তিনি ছিলেন অদ্ভুত মেধাবী। যদি নিয়মিত পড়াশুনা করতে পারতেন, তবে শুধু বাংলাদেশ তথা ভারত কেন, সারা পৃথিবীকে এমন কিছু দিতে পারতেন, যা তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখতো।[1][সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁও ঠিক একইভাবে বলেছিলেন যে, ঠাকুর যদি কোন বাদ্যযন্ত্র ছয়মাস বাজান তবে যে কোন পৃথিবীবিখ্যাত সুরশিল্পীকে ম্লান করে দিতে পারবেন।

পরবর্তীকালে ডঃ বিধান রায়ও ঠিক একইভাবে ঠাকুরের ডায়াগনোসিসের প্রশংসা করে বলেছিলেন, "আপনি যদি ডাক্তারী পড়তেন, সারা পৃথিবীকে চিকিৎসা বিজ্ঞান সমন্ধে একটা দিগন্তকারী পথ দেখিয়ে যেতে পারতেন ।"] হেডমাস্টারমশাইকে মান্নার বাবা জিজ্ঞাসা করলেন যে, এত মেধাবী এক ছাত্রের নাম তাঁরা কেটে দিলেন কেন? হেডমাস্টারমশাই দুঃখিত হয়ে উত্তর দিলেন যে, তাঁরা কোনদিন বুঝতেই পারেননি যে, পয়সার অভাবে বালক স্কুলের মাইনে দিতে পারতেন না। তাঁরা বালকের তেজোদীপ্ত সুন্দর চেহারা দেখে ধরে নিয়েছিলেন যে, বালকের পিতা তো জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করেন, সুতরাং তাঁর অবস্থা সচ্ছল এবং টাকা থাকা স্বত্বেও তিনি মাইনে দিচ্ছেন না। আর একজন মাস্টারমশাই ক্ষেত্রবাবুর কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, এক কোমর জল ভেঙে বালক তাঁর কাছে পড়া বুঝতে যেতেন। মান্নার বাবার দুঃখ হ'ল - তিনি না হয় দূরে থাকেন, ত্রৈলোক্য সোম তো পাশের বাড়িতেই থাকতেন। যে মাস্টারমশাই তাঁর ছেলেদের পড়াতেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলে অনায়াসে বালক ঠাকুরকে পড়াবার বন্দোবস্ত করে দিতে পারতেন। মান্না মিঞার বাবা যদি ঘুণাক্ষরেও জানতেন বালকের আর্থিক অবস্থার কথা, তবে তিনিই তো তাঁর সমস্ত খরচ

বহন করতে পারতেন। তাঁর মনে পড়তে লাগলো যে, তিনি বালককে তাঁর সিন্দুকের চাবি দিয়ে দিতেন, কিন্তু এত অভাব সত্ত্বেও বালক কোনও দিন চার আনার বেশি নিতেন না, তাও শুধু তাঁর মন রক্ষা করার জন্য। এত যে আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন, কাউকে কোনওদিন ঘুণাক্ষরেও জানতে দেননি। এমনকি তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধুবান্ধবও কিছুই জানতো না। কারণ অল্প দামের সাধারণ সেলাই করা জামাকাপড়, এমনকি পুরানো রিপু করা জামাকাপড়ের ভিতর দিয়েও তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব, তাঁর আভিজাত্য এমন সুন্দরভাবে ফুটে বের হ'ত যে, সবাই মনে করতো তিনি তাদের থেকে অনেক ধনী। সত্যিই তিনি ধনী - সুরের ধনী, তত্ত্বের ধনী।

মান্নার বাবা শুনলেন সেই কামারশালের কথা, যেখানে ঠাকুর স্কুলে যাবার বা আসবার পথে একবার গিয়ে বসতেন। কামার ঠাকুরের বসার জন্য যে টুলটি বানিয়েছিল, সেটি মান্নার বাবা কিনে নিতে চাইলেন। মান্নার বাবার মত স্বনামধন্য পুরুষ সেই ক্ষুদ্র কামারশালে গেছেন, তাতেই কামার আশ্চর্য হয়ে গেছে। তার ওপর আবার টুলটি কিনে নিতে চাইছেন - কামার কিছুতেই পয়সা নিতে চায় না। মান্নার বাবা দেবেনই। অবশেষে কামার টুলটি বিক্রী করলো। মান্নার বাবা অনেক কথাই সংগ্রহ করলেন। স্কুলে যখন নাম কাটা যেত তখনও বালক ঠিক সময়েই বাড়ির থেকে বের হতেন, পাছে পিতা নাম কাটা গেছে বলে দুঃখ পান। স্কুলের কাছে কুলগাছ তলায় গিয়ে বসতেন। টিফিনের সময় ছেলেরা যখন বের হ'তো, পড়া জেনে নিতেন। ছাত্রদের বই থেকে পড়া তৈরি করে নিতেন। স্কুল যখন ছুটি হ'তো বাড়ি ফিরতেন। কাউকে জানতে দিতেন না তাঁর অর্থকষ্টের কথা। শুনতে শুনতে মান্না মিঞার বাবা অসহনীয় দুঃখে ভেঙে পড়লেন। নিজেকেই তাঁর ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হলো, কেন তিনি সময় থাকতে খবরাখবর নেননি!

মাতা চারুশীলা কখনও বেড়ার বাইরে আসতেন না; অথচ টিউবওয়েল ছিল বাড়ির বাইরে। বালক মাটি কেটে বাড়ির ভিতরে উঠানে একটি চৌবাচ্চা করেছিলেন। টিউবওয়েল পাম্প করে কলার খোলের ড্রেন দিয়ে জল পৌঁছে দিতেন সেই চৌবাচ্চায়। মাতা চারুশীলা ভিতরে বসে সেই জল দিয়ে যাবতীয় কাজ করতেন। মান্নার বাবা স্মৃতিস্বরূপ সেই ড্রেন ও চৌবাচ্চার ফটো তুলিয়ে রাখলেন। তাঁর আরেকটি অভিজ্ঞতা হ'ল যে, যার সঙ্গেই তিনি বালক ঠাকুর সম্বন্ধে কথা বলেন, সে-ই অভিভূত হয়ে পড়ে। কিছুতেই তাঁকে ছাড়তে চায় না। বালক ঠাকুরের কথা বলেই যে

সে একটা অপরিসীম আনন্দ পাচ্ছে। দেখলেন, সবাই ঠাকুরকে গভীরভাবে ভালবাসে এবং তাঁর কথা বলার ও শোনার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহশীল। প্রত্যেকের কথার মধ্যে আছে একটা সুপ্ত ব্যথার সুর, প্রিয়জনকে হারালে যেমন মনে ব্যথা পায়, তেমনি ব্যথা।

এদিকে ঢাকাতে দলে দলে মানুষ আসছে ঠাকুরের কাছে - কেউ ভক্তিশ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিয়ে, কেউ বাজিয়ে দেখতে, কেউ আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা নিয়ে, কেউ বা আত্মোন্নতির চিন্তা নিয়ে, কেউ দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে, কেউ বা সংসারের অশান্তি থেকে মুক্ত হতে। যে যেভাব নিয়েই আসুক, সবাই একটা পরম তৃপ্তির সন্ধান পেয়ে যাচ্ছে। সুতরাং দিনের পর দিন ঢাকার বাড়িতে ভিড় বেড়েই চলে।

একদিন একজন টি.বি. রোগী এসে হাজির, অবস্থা খুব খারাপ। ডাক্তার জবাব দিয়েছে - যে কদিন বাঁচে! এক্সরে করে দেখা গেছে, লাংসের অবস্থা খুবই খারাপ। ঠাকুর বললেন, "তোমার রোগটা খুব ছোঁয়াচে। তুমি এক কাজ কর; সামনের মাঠে ঐ গাছটার তলায় গিয়ে বস। এদিকের কাজকর্ম সেরে লোকজনদের বিদায় দিয়ে তোমায় ডাকবো।" এদিকে বেলা বেড়েই চলছে। সূর্য মধ্যগগনে। গাছের ছায়া যেটুকু ছিল তাও চলে গেছে। কড়া রোদের মধ্যে সে বসে আছে। উঠতেই পারছে না। চার পাঁচ ঘণ্টা রোদে বসে থাকবার পর ঠাকুর তাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, "আজ বড় দেরী হয়ে গেছে। তোমার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। তুমি আর একদিন এস।" পরদিন আবার লোকটি এসেছে। ঠাকুরের নির্দেশমত গাছতলায় বসে আছে। কিন্তু সেদিনও তার ডাক পড়লো না। সেও দেখছে, ঠাকুর এত ব্যস্ত যে সময়ই পাচ্ছেন না

। সুতরাং সেদিনও সে ফিরে গেল। এমনি করে সাতদিন ধরে লোকটি আসে, নির্দেশমত গাছতলায় বসে থাকে, তারপর ঠাকুরের সময় হচ্ছে না দেখে ফিরে যায়। সেদিন সে ঠিক করে এসেছে যে, যে করেই হোক ঠাকুরের কাছ থেকে কথা আদায় করবে। ঠাকুর আবার তাকে সেই গাছতলায় রৌদ্রের মধ্যে বসিয়ে রেখেছেন। বেলা গড়িয়ে গেল। ঠাকুর ভিতরে চলে গেলেন। স্নান সেরে আবার এলেন। লোকটি তখনও রৌদ্রে বসে আছে। ঠাকুর ডেকে বললেন, "আমি তো সময় পাচ্ছি না দেখতেই পাচ্ছ। তুমি না হয় আর একদিন এস।" আজ সে কিছুতেই

সেকথা মানতে চায় না, বলে, "ঠাকুর, একটা ব্যবস্থা দিয়ে দিন। রোজ রোদে বসে বসে আর পারছি না।" ঠাকুর তাকে দুই একদিন অপেক্ষা করতে বললেন। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা, "ঠাকুর, আপনি এত লোকের এত কিছু করে দিচ্ছেন, আর আমার দিকে তাকাতে চাইছেন না।" ঠাকুর বললেন, "আচ্ছা, তুমি বুকের আর একটা ফটো তুলে নিয়ে এস। ফটোটা দেখে আমি ব্যবস্থা দেব।" লোকটি দুই-তিন দিন আর আসে না। তারপর এক্সরে ফটো বগলে নিয়ে এসেছে, দেখে মনে হচ্ছে তার চেহারাই পাল্টে গেছে। সোজা ঘরে ঢুকেই ঠাকুরের পা জড়িয়ে সে অঝোরে কাঁদতে লাগল। ঠাকুর একটু হেসে বললেন, "তোমার রোগটা তো ছোঁয়াচে, গাছতলাতে গিয়ে বসলেই ভাল হ'ত।" লোকটি তখন বললো, "ঠাকুর, তুমি তো আমাকে সারিয়ে দিয়েছ। ডাক্তার এক্সরে ফটো দেখে অবাক হয়ে গেছে। আমার অসুখের কোন চিহ্নই নেই, বুক একেবারে পরিষ্কার।"

ভক্তেরা জানতে চাইল, কি করে ওর টি.বি. রোগ সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেল। ঠাকুর সংক্ষেপে জানালেন যে, সূর্যের রশ্মিই জীবাণু ধ্বংসকারী রশ্মির কাজ করেছে। তাছাড়া ওর মনের একাগ্রতা আর তাঁর ইচ্ছা – দু'টো মিলে সমস্ত জীবাণুগুলো অপসারণ করেছে। ঠাকুর ওর এক্সরে ফটোটি দেখলেন। তারপর ফটোটি ফেরত দিয়ে বললেন, "যা, ভাল হয়ে গেছিস্। ভয় নেই, মরবি না।"

আরেক দিন। বহুলোক এসেছে দর্শন ও প্রণাম করতে – অনেকে দীক্ষাও নিচ্ছে। এমন সময় এক বৃদ্ধা মহিলা এসে কেঁদে পড়ে এবং বলে, "বাবা, শুনেছি তুমি সাধু হয়েও মা-বাবাকে ত্যাগ করনি! মা-বাবাকে ভালবাস, ভাইবোনদের দেখাশোনা কর, সবাইকে তুমি আপন করে রাখ। মা-বাপের মনে যাতে আঘাত না লাগে তার জন্য তুমি আপ্রাণ চেষ্টা কর। তাই তোমার কাছে এসেছি বাবা।"

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, "কী হয়েছে, খুলে বল তুমি কী চাও।"

বৃদ্ধা বলে, "আমার ছেলের কথা বলতে এসেছি। আমার ছেলে বরাবরই পড়াশোনায় ভাল ছিল। লেখাপড়াও করেছে অনেক। অনেকগুলো বড় বড় পাশ করেছে। কিন্তু লেখাপড়া জানলে

হবে কি! কোথায় চাকুরী করে বুড়ী-মাকে খাওয়াবে, তা না করে সে বিবাগী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শুনেছি কোন এক আশ্রমে সে নাকি আছে। ফিরিয়ে আনার জন্য কত চেষ্টা করেছি, কত যাগযজ্ঞ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করেছি। কিন্তু কিছুতেই আমার ছেলে ফিরলো না। বাবা, তুমি তো মায়ের কষ্ট বুঝতে পার। তাই তুমি চেষ্টা করলে আমার ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে।"

ঠাকুর বৃদ্ধার কাছে ছেলের নাম-ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলেন। খবর নিয়ে জানা গেল যে, ছেলে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেই কোন একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়। এখন সে কলকাতার বাইরে সেই প্রতিষ্ঠানেরই একটি শাখায় মঠাধ্যক্ষ হয়েছে।

কয়েকদিন পরে ঠাকুর একখানা গীতা হাতে নিয়ে শিক্ষার্থীর বেশে সেই মঠাধক্ষ্যের কাছে গেলেন, বললেন, "আমি আপনার কাছে শিখতে চাই।" মঠাধ্যক্ষ ঠাকুরের কথাবার্ত্তায় খুশি হয়ে গীতার ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। তিনদিন ধরে তিনি ঠাকুরকে গীতার ব্যাখ্যা শোনালেন। শিক্ষা শেষ হলে ঠাকুর বললেন, "আপনি এই কয়দিন আমাকে শেখালেন। আমি কতটা নিতে পেরেছি সেটাতো নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন।" মঠাধ্যক্ষ রাজী হলেন। ঠাকুরের অনুরোধক্রমে ঠিক হ'ল, সামনের পাহাড়টার এক নিভৃত কোণে ঠাকুর পড়া দেবেন।

পাহাড়ের ধারে একটি মনোরম পরিবেশ বেছে নিয়ে 'শিক্ষক' ও 'ছাত্র' বসেছেন। 'ছাত্র' পরীক্ষা দিচ্ছেন। গীতার এক অধ্যায় থেকে শুরু করে বলে চলেছেন ঠাকুর। তাঁর শ্রীমুখ থেকে নির্গত হচ্ছে আদিবেদের সুমধুর শ্লোক। বলতে বলতে কখন তিনি গীতার পরিধি ছাড়িয়ে মহাকাশ-তত্ত্বে চলে গেছেন, 'শিক্ষক' লক্ষ্যও করেননি; তন্ময় হয়ে তিনি শুনছেন অপূর্ব তত্ত্বের অনুরণন। তাঁর সমস্ত সত্তা এক অজানা আনন্দের স্বাদে-সোয়াদে ভরপুর হয়ে উঠেছে।..... ঠাকুর অবশেষে থামলেন। বিহ্বলচিত্তে মঠাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করেন, 'কে তুমি? তুমি তো আমার কাছে গীতা শিখতে আসনি!' ঠাকুর হঠাৎ মঠাধ্যক্ষের হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন, "আমি তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছি। পিতামাতাকে কষ্ট দিয়ে, মানুষের মনে ব্যথা দিয়ে কখনও প্রকৃত ধর্ম হয় না। ত্যাগের মাধ্যমে যে সেবা, সেই সেবা তো মাতাপিতা, পরিজনবর্গকে বাদ দিয়ে নয়। সবাইকে নিয়েই তোমায় চলতে হবে।" মঠাধ্যক্ষ অভিভূত হয়ে বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন।" এতক্ষণে

ঠাকুরের পরিচয় পেয়ে সে আর দ্বিধা করলো না। তখনই মঠ থেকে বিদায় নিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে ট্রেনে উঠলো। ঢাকায় পৌঁছে বৃদ্ধাকে ডেকে তার হাতে ছেলেকে তুলে দিলেন। ছেলেকে বললেন, "মহারাজ, এবার কিছুদিন মায়ের সেবা কর, সংসার ধর্ম পালন কর।"[1] [কয়েক বছর পরের কথা। ঠাকুর কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। ট্রেন থেমেছে বর্ধমান স্টেশনে। প্লাটফর্মে পায়চারী করছেন, এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে প্রণাম করলেন, সঙ্গে একটি মহিলা এবং দুই তিনটি ছেলেমেয়ে। ঠাকুর রগড় করে বললেন, ' মহারাজ যে, কেমন আছ? মহারাজের আবার এগুলি কি?' ভদ্রলোক বললেন, 'ঠাকুর, আপনি আমায় বাঁচিয়েছেন। ভুলের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছিলাম। প্রকৃত পথের সন্ধান আপনিই দিলেন।'

এরকম বহু ঘটনা আছে, যেখানে ভ্রান্ত পথচারীকে ঘরে ফিরিয়ে এনে বহু সংসার জোড়া দিয়েছেন। সংসারযাত্রার মধ্য দিয়েই অভীষ্টকে পাওয়া যায়, তা তারা বুঝেছে। তার জন্য সংসার ছেড়ে বনে যাবার প্রয়োজন হয় না। বুঝেছে যে, সৎভাবে জীবনযাপন করলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায়।]

নারায়ণগঞ্জ। গেরুয়া কাপড় পরিহিত এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকছেন, "মহেন্দ্র[1][উজানচর-কংসনারায়ণ স্কুলের হেডমাস্টার হিসাবে মহেন্দ্রবাবুর (মহেন্দ্রনাথ দাস) ওই অঞ্চলে যথেষ্ট সুনাম ছিল। মহেন্দ্রবাবুর মত দক্ষ হেডমাস্টার সে যুগেও বিরল ছিল। অথচ তিনি কখনও রাগ করে কারও সাথে কথা বলতেন না। যোগেশ চৌধুরীর ('পরিচিতি-চিত্রকথায়' তাঁর ফটো আছে ৪২ পৃষ্ঠায়) মত মহেন্দ্রবাবুও বিশ-পঁচিশ গ্রামের মধ্যে প্রথম গ্র্যাজুয়েট। তাঁর বড় ছেলে ধীরেন্দ্র একটা কাপড়ের মিলে স্পিনিং মাস্টার। ধীরেন্দ্র দাসও সপরিবারে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। যোগেশ চৌধুরীর দীক্ষা - 'পরম বিস্ময় বালক ঠাকুর' (প্রথম পর্বে) উল্লিখিত আছে(??? পৃ:)] আছ, মহেন্দ্র?" মহেন্দ্রবাবুর নাতিনাতনীরা বেরিয়ে এসেছে দেখতে, কে তাদের দাদুকে নাম ধরে ডাকে? মহেন্দ্রবাবুও আশ্চর্য হয়ে গেছেন এতকাল পরে কে তাঁর নাম ধরে ডাকতে পারে! তিনি বেরিয়ে এলেন - কিন্তু আগন্তুককে চিনতে পারছেন না, বললেন, "যে বেশ ধারণ করা

হয়েছে, তাতে তো চিনতে অসুবিধা হচ্ছে।" আগন্তুক বললেন, "এই তোমার স্মরণ শক্তি! আমি তো একবারেই চিনতে পারলুম। আমার নাম যোগেশ।"

মহেন্দ্রবাবু বললেন, "ও যোগেশ! তা এতদিন পরে কি মনে করে?"

যোগেশ চৌধুরী – "আমি তোমার খবরাখবর ঠিকই নেই। তুমিই চুপচাপ বসে আছ। 'তুমি বেঁচে আছ', সেই খবরই তো পাচ্ছিলুম না। তারপর তোমার এক ছাত্রের কাছে ঠিকানা পেয়ে সোজা চলে এসেছি। চল, এখনি তোমায় এক জায়গায় নিয়ে যাব।"

মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞেস করেন, "কোথায় নিয়ে যাবে?"

"আমি ভগবানের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তোমাকেও তাঁর কাছে নিয়ে যাব বলেই এসেছি" - এই কথা বলে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা থেকে শুরু করে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাতের বিস্ময়কর ঘটনা আদ্যোপান্ত বলে যোগেশ চৌধুরী বললেন, "আর দেরী করো না, এখনই চলো।" মহেন্দ্রবাবু তাঁর গলাবন্ধ কোটটি পরে তৈরি হয়ে এলেন। দুই বন্ধু ঢাকা অভিমুখে রওনা হলেন।

এদিকে ঠাকুর তখন দর্শন দিচ্ছেন। ঘরের মধ্যে বেশ কিছু লোক। দুই বৃদ্ধ এসে ঢুকলেন। মহেন্দ্রবাবুকে দেখেই ঠাকুর চিনতে পারলেন। তিনি প্রণাম করবার আগেই তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'মাস্টারমশাই, কেমন আছেন?' 'মাস্টারমশাই' ডাক শুনে বৃদ্ধ তো হতবাক! ঠাকুর তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন, "আপনি উজানচর স্কুলে ছিলেন না? আমি উজানচর স্কুলের ছাত্র ছিলাম, সুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ছেলে। মনে নেই, আমি যখন ভর্তি হতে যাই আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বলতো, নীতিসুধা বানান কি'? আমার উত্তর শুনে আপনি বলেছিলেন, - "এ ছেলের জন্য ভাববেন না সুরেন্দ্রবাবু, ও ভালই হবে।" মহেন্দ্রবাবুর সব কথা মনে পড়ে গেল। তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, "যোগেশ, কার কাছে আমাকে এনেছিস্? এই নারায়ণ তো আমার ছাত্র। ওঁকে তো আমি ওঁর শিশুবয়স থেকেই জানি। উনি তো আমার বন্ধু সুরেন্দ্রবাবুর ছেলে। ওঁর শিশুবয়সের কত অলৌকিক ঘটনার কথা শুনেছি!" যোগেশ চৌধুরী অবাক হয়ে সব কথা শুনছেন।

মহেন্দ্রবাবু বললেন, "বাবা, তুমি আমার ছাত্র ছিলে। আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি। তুমি এখন আমার ভবপারের কাণ্ডারী হও। নারায়ণ! তুমি আমাকে দীক্ষা দাও।" সে এক অপূর্ব দৃশ্য! উপস্থিত সকলেরই চোখে জল এসে গেল।

ঢাকাতে ঠাকুর কখনও মামাবাড়ি, কখনও প্রাণশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর বাড়ি, কখনও বা যদুনাথ রায়ের বাড়ি থাকেন। কখন কোথায় থাকেন ঠিক করে বলা যায় না। সেদিন মামাবাড়িতেই আছেন। কয়েকজন দর্শনার্থী এসেছে। তার মধ্যে দুই বৃদ্ধা একটি ষোল-সতের বছরের ছেলেকে নিয়ে এসেছে। বৃদ্ধা দুজনে আগে থেকেই ঠাকুরের দীক্ষিত। বাড়িটা ঠিক করতে পারবে না বলে ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। ঠাকুর একটা খাটের উপর বসে আছেন, পরনে ধুতি এবং সাদা ফতুয়া, গায়ে সাদা চাদর। বৃদ্ধারা ঘরে ঢুকে ঠাকুরকে প্রণাম করলো। ছেলেটি চৌকাঠের ওধারে দাঁড়িয়ে দেখছিল। একজন মহিলা ছেলেটিকে ডাকলেন, "আয়, প্রণাম করে যা।" ছেলেটি উত্তর দিল, "উনি আবার সাধু নাকি!" ঠাকুর বললেন, "থাক, ওকে নমস্কার করতে হবে না। মা-বাবা হারানো ছেলে, ও স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে চায়। ওকে ভালবাসার যে কেউ নেই!"

এরপর দুই একদিন কেটে গেছে। হঠাৎ একদিন রাত্রে ছেলেটি স্বপ্ন দেখলো ঠাকুরকে! ও যেন গিয়ে ঠাকুরের কোলে বসেছে। ঠাকুর বলছেন, "কী, আমার কাছে আসবি না বলে!"

খুব ভোরে সেদিন ঘুম ভেঙে গেল ছেলেটির।[1][দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী] ভোরে উঠে স্নান করে গায়ত্রী মন্ত্র পড়লো কিছুক্ষণ। তারপর সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। সোজা ঠাকুরের মামাবাড়ি গিয়ে উপস্থিত। কিন্তু ঠাকুর সেখানে নেই, আর একটা বাড়িতে আছেন। সাইকেলে উঠে চলতে আরম্ভ করলো। একটা বাড়ির গেটের সামনে দেখে মন্টু রায় দাঁড়িয়ে। মন্টু অন্য এক দলের ছেলে, সুতরাং তার সঙ্গে সদ্ভাব নেই। মন্টু রায় ওকে ডেকে বললো, "আমার গুরুদেব ডাকছেন তোমাকে।" ওর কথায় কান না দিয়ে ওকে ঠেলে ছেলেটি ঘরে ঢুকলো। দেখলো, একটি সাদা চাদর মোড়া খাটের উপর সাধারণভাবে ঠাকুর বসে আছেন। তাকে দেখে বললেন, "কী, এলি তো!" ছেলেটি বলে, "বল তো আমি কেন এসেছি?" ঠাকুর বললেন, "কাল আমি তোকে কোলে করে বসেছিলুম, বুঝতে পারিসনি?" স্বপ্নের কথা ঠাকুরের মুখে শুনে ছেলেটি অসহায় শিশুর মত হাউহাউ

করে কেঁদে বলে উঠলো, "ঠাকুর, আমায় দীক্ষা দাও।" ঠাকুর তাকে কোলের উপর বসিয়ে দীক্ষামন্ত্র দিয়ে দিলেন, বললেন, "সব সময়ে জপ করবি।"

কিছুদিন পরের কথা। ছেলেটি এসে একদিন ঠাকুরকে ধরলো যে, তার এক আত্মীয়ের বাড়ি সাংঘাতিক ভাবে বসন্ত রোগ দেখা দিয়েছে। ওখানে একটি মেয়ে, তার নিকট আত্মীয়া[1][দ্বিজেন চক্রবর্ত্তীর ভাইঝি, - কৃষ্ণা চক্রবর্ত্তী] থাকে, তাকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই ঠাকুরকে ওদের বাড়িতে নিয়ে গেল। রাস্তায় ঠাকুর বলে দিলেন, "ওরা তোকে প্রসাদ খেতে দেবে। খবরদার খাবি না। তুই বলবি যে, তুই গুরুর প্রসাদ খাস্ না। যদি ওখানে খাস্ তো নির্ঘাৎ তোর বসন্ত হবে।" সেই বাড়িতে গিয়ে ঠাকুর মেয়েটির গায়ে একটু জল ছিটিয়ে দিলেন। ওরা ছেলেটিকে প্রসাদ খেতে দিল। সে সোজা বলে দিল, "আমি কোন প্রসাদ খাই না।" তারা একচোট ছেলেটিকে বকলো। ঠাকুর বললেন, "দেখছো তো, কি রকম ছেলেদের আমাকে গড়ে-পিটে নিতে হচ্ছে!" ছেলেটি বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। বাইরে এসে পরে ঠাকুর বললেন, "বড় বাঁচা বেঁচেছিস।" .....মেয়েটি সে যাত্রা বেঁচে উঠলো।

ছেলেটি মাঝে মাঝে অবাধ্যপনা করতো। এমনি একটি ঘটনা ঘটলো, যখন ছেলেটি তার এক পরিচিত ব্যক্তির[2][বলাই গাঙ্গুলী] ক্যান্সার রোগ সারানোর জন্য অনুরোধ করলো। ঠাকুর মাথা নেড়ে জানালেন, "হবে না।" 'কেন হবে না', তিনি বললেন না। ছেলেটি তখন একটা বুদ্ধি খাটালো। তার ধারণা, মায়েদের প্রতি ঠাকুরের একটা দুর্বলতা আছে। সুতরাং সে সোজা দেশের বাড়িতে গিয়ে এবার রোগীর মাকে নিয়ে এল। বুড়ীকে দেখে ঠাকুর ছেলেটিকে বললেন, "তুই বুঝি ওকে এনেছিস্?" তারপর বললেন, "ঠিক আছে। রোজ যদি তুই ১৬ ঘণ্টা করে একমাস জপ করতে পারিস, তবে ওর রোগ সেরে যাবে। তবে ১৬ ঘণ্টা থেকে কয়েক সেকেন্ডও কম হলে চলবে না। কম হলে তোর ক্যান্সার হবে।" বুড়ীকে বললেন, "ওকে ধর। তোমার ছেলের ক্যান্সার ওই সারিয়ে দেবে।" একটু পরে মহিলাটি চলে গেলেন। ছেলেটি এইবার ঠাকুরকে দোষারোপ করে বলতে শুরু করলো, "তুমি পারবে না তাই বলো। এরকম একটা শর্ত দিয়ে ভাঁওতা দিচ্ছ কেন?" ঠাকুর কোন জবাব দিচ্ছেন না বলে সে আরও কয়েকটি কটূক্তি করলো। হঠাৎ ঠাকুরের আরক্তিম

ললাট থেকে এক ঝলক আগুনের মত রশ্মি এসে ছেলেটির মুখটি পুড়িয়ে দিল। ছেলেটি মুখ ঢেকে ফেললো। ঠাকুর শান্তভাবে বললেন, "গুরুর সঙ্গে এভাবে কথা বলতে নেই রে!" সে আয়নাতে মুখ দেখলো। মুখ পুড়ে কালো হয়ে গেছে, জ্বালা করছে। সে বললো, "তুমি দুঃখ করবে কেন? আমি তো এই চেয়েছি। তোমার সঙ্গে তর্ক করে আমি আসল জিনিস দেখতে চেয়েছি।" ঠাকুর একজনকে চন্দন বেটে আনতে বললেন এবং নিজেই ছেলেটির মুখে লাগিয়ে দিলেন। বাড়িতে খবর পাঠালেন, "তিনদিন ও বাড়িতে যাবে না।" তারপর ছেলেটিকে বললেন, "আমি তোকে হনুমান বানাবো।" ..... দু'তিন দিনের মধ্যে মুখ থেকে এক পর্দা চামড়া উঠে গেল – তিন দিনেই ছেলেটি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে উঠল।[1][পরের ঘটনা - সেই ক্যান্সার রোগাক্রান্ত লোকটিকে কলকাতা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। সেখানে ওর পা কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হ'ল। একটু একটু হাঁটতেও পারতো। ছেলেটি ঠাকুরকে জানালো। ঠাকুর কোন কথা বললেন না। তারপর একদিন লোকটি তার মেজদির সঙ্গে গরুর গাড়ী করে কৃষ্ণনগরে যাচ্ছিল। সামনে দেখলো এক সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ছেন, যেমনভাবে প্রথমদিন ঠাকুর ছেলেটির প্রস্তাবে মাথা নেড়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই ঝলকে ঝলকে রোগীর মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগলো। রোগী মারা গেল।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ছেলেটি রোগীর এমন একটি নীতিবিরুদ্ধ অপরাধের কথা জানতে পারলো যে, তার হয়ে ঠাকুরের কাছে আবেদন করার জন্য নিজেকেই সে অপরাধী মনে করতে লাগল।]

দোগাছিতে অনেক কাজ জমে গেছে। ঠাকুর কিছুদিনের জন্য দোগাছি গেছেন। ঠাকুর আসাতে চারিদিকে প্রচার হয়ে গেছে এবং দলে দলে লোক আসছে। এর মধ্যে সেদিন নৌকা করে একজন ভদ্রলোক তিনজন সাথী নিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল। ভদ্রলোক পেটের ব্যথায় বহুদিন ধরে ভুগছে। অসহ্য ব্যথা; পেটে হাত দিয়ে বাঁকা হয়ে চলাফেরা করতে হয়। বহু ডাক্তার কবিরাজ দেখিয়েছে, বহু টাকা খরচ করেছে। কোনটাতেই কিছু হয়নি। তাই ঠাকুরের নাম শুনে এসেছে - যদি তিনি ভাল করে দেন। ঠাকুর ওদের বসতে বলে অন্যান্য কাজ সেরে নিলেন। উপস্থিত ভক্তদের বললেন, "ওর সঙ্গে একটু দর কষাকষি করে দেখি কতদূর উঠানো যায়।" রোগীকে এবার

ডাকলেন। রোগী প্রণাম করে বসলো। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি যে ভাল হতে চাও, কত টাকা এ পর্যন্ত খরচ করেছো, আর কত টাকা খরচ করতে পারবে?" ঠাকুর এমনভাবে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কেউ শুনলে মনে করবে ঠাকুর বেশ কিছু টাকা ওর কাছ থেকে নিতে চাইছেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য তো অর্থের বিনিময়ে রোগ সারানো নয়, তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্যের প্রতিষ্ঠা করা। সত্যে যে শক্তি রয়েছে, সেই শক্তিকে বিকাশ করা। সে বললো, 'আমি যদি সেরে যাই, যতটা প্রয়োজন দিতে চেষ্টা করবো।'

ঠাকুর – তুমি প্রতিকারের জন্য কি করেছ?

রোগী – সাধু-সন্ন্যাসী, পূজা-পার্বণ, ডাক্তার-বদ্যি সবই করেছি। হাজার হাজার টাকা বেরিয়ে গেছে।

ঠাকুর – যদি ভাল হও, যত টাকা ব্যয় করেছ, তত টাকা দিতে পারবে?

রোগী একটু চিন্তা করে বললো, 'আমি ভাল হলে দিতে পারবো। প্রায় নয় দশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে।'

ঠাকুর – আগে যদি কিছু প্রয়োজন হয়, দিতে পারবে?

রোগী – দিয়েই যখন এসেছি, শেষ চিকিৎসায় না হয় দেখবো।

ঠাকুর – প্রথমতঃ বারো শ' টাকার যদি প্রয়োজন হয়? পরে না হয় বাকীটা দিয়ে যেও।

সে একটু চিন্তা করে রাজী হয়ে গেল। ঠাকুর একগ্লাস জল আনতে বললেন। জলের মধ্যে একটি আঙ্গুল স্পর্শ করে রোগীকে বললেন, "এই জলটুকু খেয়ে নাও। তাহলেই তুমি ভাল হয়ে যাবে।"

সে গ্লাসের জল খেয়ে ফেললো। তারপর প্রণাম করে চলে গেল।

রোগী তার পরদিনই এসে উপস্থিত। বাড়ি যাওয়ার পথেই তার ব্যথার উপশম হয়ে গেছে। সে একটা 'চেক' ঠাকুরের পায়ে দিয়ে প্রণাম করলো। চেক হাতে নিয়ে ঠাকুর বললেন যে, সহজে কেমন রোজগার করা যায় চেকটা তারই এক দৃষ্টান্ত। তিনি রোগীর জন্য কিছুটা করেছেন এবং সে ফলও সে পেয়েছে। সুতরাং তাঁর প্রাপ্যের দিক দিয়ে ঠিকই আছে। তবে চেকটা নেওয়া তিনি ছলনা মনে করেন। যে একাগ্রতা বা মনঃশক্তি তিনি ব্যয় করেছেন, একজন শক্তিমানের কাছে তা অতি সাধারণ। সুতরাং টাকা নেওয়াটাই হ'ল ছল। অর্থের তাঁর প্রয়োজন আছে সত্যি, কিন্তু তিনি প্রবঞ্চনা করতে রাজী নন। তাই 'চেক'টি ছিঁড়ে রোগীর হাতে দিলেন।

ঠাকুরের কথা শুনে রোগী আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল। এখন 'চেক'টি ছিঁড়ে ফেলাতে সে হতবাক হয়ে গেল। বুঝতে পেরে ঠাকুর বললেন, "তোমাকে সারিয়ে দিয়ে যে তৃপ্তি পাচ্ছি, তার বিনিময়ে তুমি তো আমার অপকার করতে পার না।"

রোগী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বললো, "আমি কি কোন অপরাধ করেছি?"

ঠাকুর উত্তর দিলেন, "তোমার চেকটি যদি আমি গ্রহণ করি আমার অপরাধ হবে। আর সেই অপরাধ করতে সহযোগিতা করার জন্য তুমিও দায়ী এবং অপরাধী হবে। তোমার সঙ্গে আগাগোড়া খেলা করছিলাম। সবাইকে জানিয়ে দিলাম যে, ছলচাতুরী করলে কতটা নামা এবং নামানো যায়। এবং প্রকারান্তরে অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করা যায়। তাই দেখাবার জন্য তোমার সঙ্গে ঐরকম কথাবার্ত্তা বলছিলাম। প্রবঞ্চনা বা ছলনা করলে, নিজের কাছে নিজের ফাঁকিই যে ধরা পড়ে। তাই জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচারে শক্তি এসে প্রতিফলিত হয়ে আবর্জনা দূরীভূত করে সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। তার জন্যই শক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং সেই শক্তিকেই বাড়াতে হবে। যখন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনই সত্যবস্তুর তত্ত্বকে বুঝে নিতে পারবে।"

রোগী ভদ্রলোক[1][সতীশ সাহা - বিক্রমপুর (শ্রীবীরেন্দ্র বাণী)] সমস্ত বুঝে, চোখের জল ফেলে ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলে গেল, "আমি বহু ঘুরেছি। কিন্তু আমি ভাবিনি, দেখিনি, চিন্তা করতে পারিনি যে, এই পৃথিবীতে এরকম কেউ আছেন।"

কিছুদিন পরের কথা। ঠাকুর ঢাকাতেই আছেন। ঠাকুরের পরম ভক্ত 'কালা ডাক্তার' ঢাকাতেই ঠাকুরবাড়ির কাছে থাকে। সেদিন বেলা হয়ে গেছে তবু কালা ডাক্তার[2][ধীরেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার] বাড়ি ফেরেনি। তাঁর ছোট ভাই খোঁজে বেরিয়েছে। এখানে ওখানে সব জায়গায় খোঁজ করে করে শেষে ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। কারণ সে জানে দাদা ঠাকুরবাড়িতে একবার যাবেই। ঠাকুরের ঘরে যখন ঢুকলো, ঠাকুর তখন সাদা চাদর গায়ে চৌকির উপর ধ্যানস্থ অবস্থায় বসে আছেন; আর মহম্মদ আলি ঘরের কাজকর্ম করছে। ঠাকুরের পায়ের কাছে একটি মোড়া ছিল। যুবক সেই মোড়াটির উপর বসে পড়লো। তারপর ধীরে ধীরে ঠাকুরের চরণযুগল স্পর্শ করলো। স্পর্শ করা মাত্র বিরাট এক বৈদ্যুতিক শক্ খেয়ে হাত সরিয়ে নিল। ঠাকুর চোখ মেলে তাকিয়ে বললেন, "কে তুমি? কি চাও?" যুবক সংক্ষেপে উত্তর দেয়, "আমি কালা ডাক্তারের ছোট ভাই। দাদার খোঁজ করতে এসেছি।" ওর ইচ্ছে হতে লাগলো, আবার ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করে। সাহসে ভর করে ঠাকুরের পাদস্পর্শ করলো। এবার কিন্তু শক্ খেল না; সমস্ত শরীরের ভিতর এক অপূর্ব শিহরণ বোধ করলো। পা দু'খানি তুলোর মত নরম এবং বেশ গরমও। মনে হয়, যেন প্রায় ১১৫º ডিগ্রী টেম্পারেচার হবে। পা টিপতে তার বেশ ভাল লাগছিল। ধীরে ধীরে পা টিপতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর উঠে ভিতরে চলে গেলেন। দাদার দেখা সে পেল না। হয়তো বা ভিতরে কোথাও আছে। অতঃপর যুবক বাড়ি ফিরে গেল।

পরদিন সকালবেলা তার দাদা বললো, "ঠাকুর তোকে ডেকেছেন।" অদম্য কৌতূহল চেপে যুবক জিজ্ঞাসা করে "কেন?"

দাদা বললো, "তা তো জানি না। তবে মনে হয়, তোকে দীক্ষা দেবেন।" যুবক বলে ওঠে, "আমার মাত্র বাইশ-তেইশ বছর বয়স। এখনই দীক্ষা নেব কেন?" এদিকে ঠাকুরের কাছে যাবার ইচ্ছা। সুতরাং সে বলে, "আমি তো স্নান করিনি।"

দাদা - স্নান করতে হবে না। এই অবস্থায়ই চলে যা।

যুবক – আমি তো খেয়েছি। দীক্ষা নেব কি করে?

দাদা – তাতে ক্ষতি নেই। খেয়েছিস্ তো কি হয়েছে?

যুবক – কিছু তো সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়।

দাদা – না। কিছু নিতে হয় না। বাগান থেকে একটা ফুল নিয়ে নিস্। মন দক্ষিণা দিলেই হবে। তিনি আর কিছু চান না।

যুবক – কখন যেতে হবে?

দাদা – এখনই চলে যা।

যুবক তখনই রওনা হ'ল। ঠাকুরের ঘরে ঢুকে দেখে দু'টি আসন পাতা। পাশে একটি পুষ্পপাত্র। ঠাকুর ঘরে এসে আসনে বসলেন এবং যুবকটিকে আরেকটি আসনে বসতে বললেন। তখন দূরে একটি ঘণ্টা বাজলো। সকাল সাড়ে আটটা। ঠাকুর যুবকটির দ্বিদলে আঙ্গুল স্পর্শ করার সাথে সাথে মনে হ'ল যেন একটি তপ্ত লৌহ শলাকা ওর দ্বিদল দিয়ে প্রবেশ করছে। ঠাকুর দীক্ষা দিয়ে উঠে গেলেন। যুবকটির কোন সম্বিৎ নেই। দূরের ঘড়িতে ঢং ঢং করে নটা বাজলো। ধীরে ধীরে তার ঘোর কেটে যায়। মনপ্রাণ ভরে ওঠে এক অনাস্বাদিত আনন্দে। শরীর যেন হালকা হয়ে গেছে। মনের আনন্দে যুবক বাড়ি ফিরে গেল। .....

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। ঠাকুর উজানচর-কৃষ্ণনগরে গেছেন। এদিকে কুকুটিয়া গ্রামের সতীশ সাহার বাড়িতে শনি-সত্যনারায়ণ পূজা। শচীন দাসের [শচীন দাস - দোগাছি গ্রামের অধিবাসী] সেখানে নিমন্ত্রণ। সে তার দাদাকে যেতে বললো। দোকানের কর্মচারীটিকেও ছুটি দিল। শচীনের দাদা বললো, "চোরের খুব উপদ্রব। তুই একা থাকবি?" শচীন বলে, "কিছু হবে না। তোমরা সবাই যাও।"

সবাই চলে গেলে পাশের দোকান থেকে কিছু নারকেল ছোবড়া আর ধূপ নিয়ে এসে ধুনুচি জ্বালিয়ে ঠাকুরের ফটোর সামনে বসে শচীন জপ করতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ পরে শোঁ শোঁ আওয়াজ হতে লাগলো। শচীন চাদর মুড়ি দিয়ে নিচু হয়ে বসে রইল। এমন সময় ঠাকুরের গলার

স্বর শুনতে পেল, "শচীন চেয়ে দেখ, আমি তোর গুরু। আমি তোর ডাক শুনে থাকতে পারলাম না। চলে এলাম। অন্য ঘরে দেখলাম, একজন মোটা লোক শুয়ে আছে – সেই ঘরে ভর্ত্তি কাপড়।" শচীন বললো - "ও আমার বন্ধুর বাবা।" ঠাকুর বললেন, "উজানচরের একটা ঘরে মা আর আমি শুয়েছিলাম। আমিতো এভাবে আসিনা। তুই যে ডাকছিস্, তাই তো এসে পড়েছি। মা খুঁজছেন। আমি তাড়াতাড়ি চলে যাই। তুই কাল উজানচরে যাবি, বুঝলি?" শচীন দাস পরের দিনই সতীশ সাহাকে নিয়ে উজানচর-কৃষ্ণনগরে রওনা হ'ল।

কৃষ্ণনগরে ঠাকুমা (ঠাকুরের মা) শচীন দাসকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ঠাকুর নাকি কাল রাত্রে তোমার কাছে গিয়েছিল?" শচীন দাস বললো, "হ্যাঁ ঠাকুমা।"

"তাই তো, ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ – এভাবে তো যায় না। আমি তাই কত খোঁজাখুঁজি করেছি।" ঠাকুমা বললেন।

ঠাকুর তাড়াতাড়ি আসতে বলেছেন। এদিকে ঠাকুমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেরী হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর ঠাকুরের কাছে গিয়ে দেখে ঘরের দরজা বন্ধ। ঠাকুর একজন কলেজের ছাত্রের সঙ্গে আলাপ করছেন। দরজার ফুটো দিয়ে দেখে যে, ছেলেটির কপালে ঠাকুর একটি টর্চের বাল্ব ধরে ঘরটা আলোকিত করেছেন। শচীনের তর সয় না। দরজায় ধাক্কা দেয়। দরজা খোলা হ'ল। শচীন দাস অভিমান করে ঘরের কোণে গিয়ে বসে থাকে। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, "শচীন, তুই কিছু দেখেছিস্? এত রাগ করছিস্ কেন?" শচীন কেঁদে ফেলে বলে, "আমি তোমার ভক্ত হতে পারিনি। আমি আর কি দেখবো?" ঠাকুর বলেন, "রাগ করিস্ না। তোর ভিতরেও কারেন্ট (current) আছে, দেখিয়ে দিচ্ছি।" এই বলে টর্চ বাল্বটি ওর দ্বিদলে ধরে আলো দেখান এবং বলেন, "তোর মধ্যেও কারেন্ট আছে। সবার মধ্যেই আছে। জপ করতে করতেই আসবে এইরকম আলো, সূর্যের জ্যোতির মত এখানে এসে পড়বে।"

ঠাকুর বলেন, "শচীন, বাবা তোকে খুব দেখতে চান। বাবা তো মফঃস্বলে গেছেন। তুই বরং দুটো দিন থেকেই যা।" গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে শচীন দাস দুই দিন থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়।

রাত্রে কাছারী ঘরে ঠাকুর বিনয় পালকে বলেন, "চারটে আসন কর, একটা আমার আর তিনটি তোদের।"

এরপর ঠাকুর বলেন, "শচীন, দরজায় হেলান দিয়ে বস আর জপ কর। আর তোমরাও জপ কর।" সবাই জপ করছে। ঘরের আলো নেভানো। অন্ধকার - কিছুই দেখা যায় না। আবার ঠাকুরের কাছ থেকে নির্দেশ এল, "শচীন, জগদীশ নামে এক নমঃশূদ্র, আমার ভক্ত, সিদ্ধি-ভাঙ খায় - সে আসবে। দরজায় টোকা দিলে খুলে দিবি।" শচীন দাস জপ করছে আর ভাবছে কখন দরজায় টোকা দেবে। কিছুক্ষণ পরে দরজায় টোকার শব্দ শুনে আস্তে আস্তে দরজা খুলে দেখে, কোন লোক নেই। ওর মনে একটা ভয়-ভয় ভাব এবং কান্নার ভাব আসতে লাগলো। কোনমতে দরজা বন্ধ করে আবার দরজার সামনে এসে বসলো। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, "কি-রে শচীন, কি ব্যাপার?" শচীন কাঁদ কাঁদ ভাবে জবাব দেয়, "বাবা, একজন টোকা দিল শুনে দরজা খুললাম। কিন্তু কোনো লোককে তো দেখলাম না।" ঠাকুর বলেন, "আবার জপে বস।" কিছুক্ষণ যায়, হঠাৎ ঘরের মধ্যে শোঁ শোঁ আওয়াজ, যেন ঝড়ো বাতাস বয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন খুব দ্রুত বলে গেল, "গোঁসাইয়ের একজন ভক্ত আসছে, খুব ভালা, ভালা, ভালা"। - আবার বলছে "মাস্টারমশাই, গোঁসাই আসনে বসে আছেন কি না দেখেন তো?" বক্তার কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ অপরিচিত। অন্ধকারের মধ্যে বিনয় পাল ঠাকুরের আসন হাতড়ে দেখে ঠাকুর আসনে নেই। বিনয় বলে, "দেখি গিয়ে ঠাকুর কোথায় গেলেন।" শচীন দাস অন্ধকারের মধ্যে কি হচ্ছে বুঝতে পারছে না। নতুন জায়গা, একটু ঘাবড়েও গেছে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করল যে, এই ঘরে যে আসবে তাকে জাপটে ধরবে আর তাকে আলো না দেখানো পর্যন্ত ছাড়বে না। এই সময় "গোঁসাই কোথায়, গোঁসাই কোথায়" করতে করতে বিনয় প্রায় শচীনের কাছে এসে পড়েছে। বিনয়ের উরু চেপে ধরে শচীন বললো, "আপনি কে? অন্ধকার ঘরে আমাকে আলো দেখাতে হবে। না হলে আমি ছাড়বো না।" বিনয় বলছে, "আমি বিনয়। আপনি ভুল

করছেন।" শচীন নাছোড়বান্দা। সে বলে, "বিনয়ই হোক আর যেই হোক, আমি ছাড়বো না। আমাকে আলো দেখাতে হবে, তবে ছাড়বো।" বিনয় বলছে, "আমার মাথায় হাত দিয়ে দেখেন আপনি। আমার বাবা মারা গেছেন জানেন তো!" বিনয়ের মাথায় হাত দিয়ে শচীন বুঝলো যে সত্যি সে বিনয়। কিন্তু ওর হাতটা একটু পিছনের দিকে যেতেই আর একজনের গায়ে যে ঠেকলো। ইতিমধ্যে বিনয় বাইরে বেরিয়ে গেল। শচীন এবার অপর লোকটিকে জড়িয়ে ধরলো। তার পা জড়িয়ে ধরতেই সে বলে উঠলো, "আপনি গোঁসাইয়ের ভক্ত। আমার পা ধরবেন না, পা ধরবেন না। গোঁসাই নদীর ধারে গেছেন। আপনি সেখানেই যান।" তারপর তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, "শীঘ্র দরজা দেন, দরজা দেন – আলো আসছে।" দরজা বন্ধ করতে গিয়ে কাছারী ঘরের বড় লণ্ঠনটা থেকে যে আলো আসছে, ঐ আলোতে শচীন দেখলো যে, ঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত সাদা কাপড়। এরকম সাদা সে জীবনে দেখেনি। মনে হ'ল, মুড়ি দিয়ে কে যেন পড়ে আছে। দরজাটা বন্ধ করে শচীন এবার সাদা কাপড়ে ঢাকা লোকটিকে জড়িয়ে ধরলো - লোকটির মাথায় জটা, কোমরে কি সব বাঁধা। লোকটি বলে উঠলো, "আপনি ঠাকুরের ভক্ত। আমার পা ধরবেন না। আমি জগদীশ, জাতে চাঁড়াল। মাছ বেচে খাই, সিদ্ধি-ভাঙ খাই।" শচীন দাস কি একটা ভেবে তাকে ছেড়ে দিল। তারপর নদীর দিকে রওনা হ'ল। ওখানে গিয়ে সে দেখে বিনয় নদীর ধারের একটা বাগিচা থেকে বেরিয়ে আসছে। বিনয় শচীনকে জিজ্ঞাসা করে, "আপনি এখানে কেন?" শচীন উত্তর দেয় যে, লোকটা ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে। বিনয় আশ্চর্য হয়ে বললো যে, লোকটি ওকেও পাঠিয়ে দিয়েছে নদীর ধারে। শচীন আবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ঢুকে দেখে যে ঠাকুর আসনে বসা রয়েছেন। ইতিমধ্যে বিনয় পালও ফিরে এল। ঠাকুর শচীনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শচীন, কি ব্যাপার, কি দেখলি তুই?" শচীন আদ্যোপান্ত সব বললো। সব শুনে ঠাকুর বললেন, "কি করলি বোকা, এত সহজে ছেড়ে দিলি? ..... সারারাত পরিশ্রম করেছিস্। এখন শুয়ে পড়।"

শচীন দাস সহজ সরল মানুষ। সে এই খেলা বুঝতে পারে না। পরের দিন সকালে ঠাকুর ওকে সঙ্গে নিয়ে বাজারের কাছে গেলেন এবং দূর থেকে জগদীশকে দেখিয়ে দিলেন। জগদীশের কাছ থেকে মাছ কিনে নিয়ে ফিরে এল শচীন, অথচ তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলো না।

ঠাকুর আবার পাঠালেন শচীনকে মাছওয়ালার পরিচয় জানতে। এবার সে বুঝল, যে জগদীশকে রাত্রে জাপটে ধরেছিল, সে এই জগদীশ নয়। এর মাথায় জটা নেই। শচীন জিজ্ঞাসা করাতে জগদীশ উত্তর দিল যে, সে তিন-চারদিন ঠাকুরবাড়ি যায় নি।

সারারাতের শ্রমক্লান্ত শচীনের যখন অপরাহ্ণে ঘুম ভাঙলো, ঠাকুরের পিতা তখন বাড়িতে ফিরে এসেছেন। শচীনকে দেখে তিনি খুব খুশি হলেন, বললেন, "শচীন, কীর্তন করো।" ইতিমধ্যে জগদীশ বহু লোক নিয়ে এসেছে কীর্তন করবে বলে। ঠাকুর শচীনকে জগদীশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। জগদীশ বললো, "আমার জীবনটাই গোঁসাই পালটে দিয়েছেন। এখন আমি মাছ বিক্রী করে খাই। যে জগদীশ কাল রাত্রে আপনাদের কাছে এসেছিল সে আমি নয়। প্রকৃত 'জগদীশ'ই এসেছিলেন। গোঁসাই আপনার সঙ্গে একটু খেলা করছিলেন। দুঃখ করবেন না। এই গোঁসাই যখন নদীর ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছিলেন, আমি সাঁতরে তাকে ধরতে যাই। কাছাকাছি গিয়েছি, এমন সময় একটা কুমীর আমার পা কামড়ে ধরলো। আমি তখন চিৎকার করে বললাম, 'গোঁসাই, তোমাকে ধরতে এসে শেষে আমার জীবনটা কুমীরের হাতে যাবে?' গোঁসাই ছোঁ মেরে আমাকে শূন্যে তুলে নিলেন। আমি অনেককে কুমীরের গ্রাস থেকে নিজেই বাঁচিয়েছি। কিন্তু গোঁসাই যেভাবে আমাকে সেদিন বাঁচালেন, মানুষের পক্ষে সেভাবে বাঁচানো সম্ভব নয়।"

জগদীশের কথা শুনে শচীনের মনে যে অভিমানের রেশটুকু ছিল তা মিলিয়ে গেল। সবাই মিলে মহানন্দে কীর্তন শুরু করে দিল।

আগের মতই উজানচরে এলে, সেই ছোট্ট চৌচালা ঘরটিতে ঠাকুর মাঝে মাঝে রাত কাটান, আবার কখনও কাছারী বাড়ির ঘরটিতে থাকেন। অনেক ভক্তই ঠাকুরের কাছে বসে ধ্যান ধারণা করে। ঘুমিয়ে রাত কাটানোকে ঠাকুর নিজে সময় নষ্ট করা মনে করেন। খুব ক্লান্ত বোধ করলে মাটির আসনেই কাগজে মোড়া ইট মাথায় দিয়ে একটু বিশ্রাম করে নেন। তবে ঘণ্টাখানেকের বেশি সাধারণতঃ বিশ্রাম করতে দেখা যায় না। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে তখন তিনি ঘুমিয়েছেন মনে হলেও সেই সময় কে কিভাবে কাটিয়েছে, তিনি সব বলে দিতেন। একবার এক ভক্ত ঠাকুরকে একটি চিঠি পড়ে শোনাচ্ছিল। শুনতে শুনতে ঠাকুর নিদ্রামগ্ন হয়ে গেছেন ভেবে

ভক্তটি পড়া বন্ধ করে তাকিয়ে রইল। চোখ মেলে তখনই ঠাকুর তাকালেন, জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওখানে গিয়ে কি কি করবে - লিখেছে?' ভক্তটি সেদিন বুঝে নিল যে, ঠাকুরের নিদ্রা, জাগরণ দুই-ই একই অবস্থা। শোনেননি এমন একটি শব্দও নেই।...

ঠাকুরকে আবার তাঁদের মাঝে পেয়ে, ঠাকুরের মাষ্টারমশাই প্রকাশ বল, এবং ত্রৈলোক্য সোম, হাজি মিঞা, জিন্নত আলি, হরিচরণ, অনুকূল পাল, নগেন দে প্রভৃতি অনেকেই সেদিন এসেছেন। মধ্যরাত্রি পেরিয়ে গেছে, তবু কেউ যাওয়ার উপক্রম করেন না। ঠাকুরের সান্নিধ্যে যতটুকু সময় থাকা যায়, ততটুকুই আনন্দের। টিম টিম করে ঘরে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। ঠাকুর সবাইকে একটু জপ করতে বলেছেন এবং নিজেও ধ্যানমগ্ন। হঠাৎ ঘরটি একটি অপূর্ব স্নিগ্ধ আলোর জ্যোতিতে ভরে গেল। আশ্চর্য হয়ে সবাই দেখেন, সাত আটজন জটাজুটধারী বিরাট বিরাট পুরুষ ঘরের মধ্যে বসে ঠাকুরকে অভিবাদন জানাচ্ছেন। ঠাকুরও হাত তুলে সবাইকে আশীর্বাদ করছেন। প্রকাশবাবু, ত্রৈলোক্য সোম প্রভৃতি যাঁরা যাঁরা ছিলেন, সন্ত্রস্ত হয়ে চুপ করে বসে দেখতে লাগলেন। মনে তাঁদের অনেক প্রশ্ন আসছে, কিন্তু সাহস করে কিছু বলছেন না। এ সময়ে কিছু বলা সমীচীন হবে কি না বুঝতে পারছেন না। কখনও এক বিচিত্র দুর্বোধ্য ভাষায় আগন্তুকরা কথা বলছেন, আবার কখনও নিঃশব্দে বসে শুনছেন ঠাকুরের কথা। ঠাকুর মাঝে মাঝে হাত নাড়ছেন কতকটা মুদ্রার ভঙ্গীতে; আবার তাঁর নিজস্ব ভাষায় ছন্দে-ভরা মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। আগন্তুক ঋষিরা বেশি কথা না বললেও বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, যেসব সমস্যা নিয়ে তাঁরা এসেছেন, তার সমাধান করে দিচ্ছেন ঠাকুর। প্রায় ঘণ্টাখানেক এইভাবে অতীত হ'ল। অনেকক্ষণ পূর্বেই কুরল পাখির ডাক রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সংকেত দিয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ সেই জ্যোতি মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক ঋষিরাও অন্তর্হিত হলেন। ঠাকুরের মুখে-চোখে একটা অদ্ভুত গাম্ভীর্য। মনে হচ্ছে যেন কাছে থেকেও বহু দূরে। ভক্তেরা নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করছেন এই মহানদের সম্বন্ধে। কেউ বলছেন, "এঁরা এই জগতের মানুষ নন। এত দীর্ঘাকৃতি পার্থিব মানুষের হয় না।" আবার কেউ বলছেন, "এঁরা অতি প্রাচীন অথচ কি সুন্দর এঁদের দেহের গঠন!" প্রকাশবাবু এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। ঠাকুর চোখ মেলতেই জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কী দেখলাম ? এঁরা কারা? কোথা থেকে এলেন? কি ভাবেই বা

এত রাত্রে গেলেন?" ঠাকুর বললেন, "ওঁরা বিরাট বিরাট সাধক - সবাই বিদেহী। আকাশপথে যাচ্ছিলেন, নেমে আমার সঙ্গে দেখা করে গেলেন। কিছু আলাপ-আলোচনাও করে গেলেন। ওঁদের সঙ্গে কথা বললেন না কেন? কথা বললেই সব জানতে পারতেন।" প্রকাশ বল – আমাদের সঙ্গে ওঁরা কথা বলতেন?

ঠাকুর – বলবেন না কেন? ওঁরা খুব ভদ্র, খুব অমায়িক। আমার যখন আট-নয় বছর বয়স, তখন থেকে ওঁদের ভিন্ন ভিন্ন দল এসে আমার সঙ্গে দেখা করে যাচ্ছেন। আমার দিদিমা তো ওঁদের সাথে অনেক কথা বলতেন, অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করতেন। দিদিমাকে ওঁরা খুব শ্রদ্ধা করতেন।

প্রকাশ বল – আহা! তবে তো আমরাও কথা বলতে পারতাম!

ঠাকুর - হ্যাঁ, তা তো পারতেনই।....

কলকাতায় বোধ হয় এই প্রথম এসেছেন ঠাকুর। প্রথম না হলেও কলকাতার বাস্তব জীবনের সাথে তাঁর বিশেষ পরিচয় নেই। বাস্তবে দৈনন্দিন চলাফেরার ব্যবস্থা ভক্তরাই করে, সুতরাং তাঁকে এই বিষয়ে সাধারণতঃ চিন্তা করতে হয় না – এটাই সাধারণের ধারণা। এবার সঙ্গে আছে এক ভক্ত, যার ধরন-ধারন, চালচলন দেখলে বোঝা শক্ত যে, সে কলকাতা শহরের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নয়। ঠাকুরের কয়েক জায়গায় যেতে হবে, কিন্তু তিনি যেতে চান বিনা আড়ম্বরে, যাতে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। স্বভাবতঃই ঠাকুর সাধারণের সঙ্গে সাধারণ ভাবে মিশে থাকতে ভালবাসেন। তাই ক্ষেতে যখন চাষ করেন দেশের বাড়িতে, ক্ষেতের চাষীর মতই থাকতে ভালবাসেন। তার মধ্যেই যারা চিনে নিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করতে চায়, তাদের দীক্ষা দিয়ে দেন। এই প্রচ্ছন্নভাবে থাকবার চেষ্টা শিশুবয়স থেকেই দেখা যায়। বাস্তব সম্বন্ধে কখনও তিনি অতি সচেতন, আবার কখনও যেন কিছুই জানেন না। শিশুবয়সে যখন তাঁর মাত্র সাত বছর বয়স, তাঁর এক আত্মীয়া এসে বললেন, "বীরু,[1] [পিতৃদত্ত নাম বীরেন্দ্রচন্দ্র - সংক্ষিপ্ত আকারে গুরুজনেরা "বীরু" বলতেন।] তোর একটা ভাই হয়েছে।" শিশুঠাকুর নিজের মনে কি যেন করছিলেন, জিজ্ঞাসা

করলেন, “আমার ভাই হয়েছে? তা ছেলে না মেয়ে?” শিশুঠাকুরের উক্তি শুনে হাসির রোল পড়ে গেল। আত্মীয়াটি বললেন, “আয়, দেখে যা ছেলে না মেয়ে।” .... আর একবার মামার সঙ্গে বাজারে যাচ্ছেন আট বছরের শিশুঠাকুর। হরিজন-পট্টির কাছে কতকগুলো শুয়োর চরছে দেখে মামাকে অতি উৎসাহে বললেন, “মামা, মামা, দেখেন ইঁদুরগুলো কত বড় হয়েছে!” মামা শিশুর সরলতা দেখে হেসে বললেন, “ওগুলো ইঁদুর নয় রে, ওগুলো শুয়োর।” বালক জিজ্ঞেস করেন, “ও! শুয়োর বলে যে গালাগালি দেয় সেই শুয়োর?” মামা উত্তর দেন, “হ্যাঁ রে।” সেই প্রথম তিনি বাস্তবে শুয়োর দেখলেন। সরলতার আবরণে ঠাকুর যে বিরাট শক্তি লুকিয়ে রেখেছেন, তা সকলের নজরে পড়ে না। একদিকে তাঁর স্বচ্ছ সরলতা আর একদিকে গভীর জ্ঞানের ভান্ডার, তাঁর ব্যক্তিত্বকে এক পরম বিস্ময়কর রূপ দেয়। তিনি কখনও ধ্যান-গম্ভীর, কখনও পরম করুণাময়, কখনও বা হাস্যরসে ঝলমল করছেন। ভক্তেরা পর্যন্ত মাঝে মাঝে তাঁর হাস্যকৌতুক, রসিকতায় পরিবেশ ভুলে যায়।

সেদিন ওই কেতাদুরস্ত সঙ্গী ভক্তটিকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর কলকাতার কাজগুলো সেরে ফেলবেন ঠিক করলেন। কলকাতার ট্রাম পৃথিবীবিখ্যাত। ফার্স্টক্লাসে তেমন ভিড় হয় না। ডানলোপিলো গদী আঁটা ফার্স্টক্লাসের সিটে বসে যাতায়াত খুবই নির্ঝঞ্ঝাট। তাই ট্রামে করে ফিরবেন ঠিক করলেন। ঠাকুর ভক্তটিকে বললেন, "জিজ্ঞেস করে নে, কোন্ ট্রামে উঠতে হবে।" ভক্তটি বলে, "জিজ্ঞেস করার দরকার নেই, আমি জানি।" ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছেন। ট্রাম আসছে ঠিকই। কিন্তু সবগুলোই যে উল্টোদিকে যাচ্ছে! যে ট্রামে তাঁদের উঠতে হবে, সেগুলোর দরজা লাইনের ওপারে। ঠাকুর বললেন, "আরে, আমাদের ট্রামের দরজা তো ওপারে।" ভক্তটি বলে, “না, এর পরের ট্রামটার দরজা এদিকে থাকবে।” একের পর এক ট্রাম চলে যাচ্ছে। কালীঘাটগামী ট্রামগুলোর দরজা সব লাইনের ওপারে। ঠাকুর দুই একবার সে কথা বলেন। কিন্তু ভক্তটি প্রত্যেকবারই বলে, “এর পরের ট্রামের দরজা এদিকে হবে।” বুঝতে পারে না যে, সে উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছে। এই করে পঁয়ত্রিশটি ট্রাম চলে গেল। তবু তাঁদের ট্রামে ওঠা আর হ'ল না। ঠাকুর তখন বললেন, “ওই যে ভদ্রলোক নামলো, ওকে জিজ্ঞাসা কর।” নিরুপায় হয়ে ভক্তটি জিজ্ঞাসা করে, “এদিকে দরজাওয়ালা ট্রামগুলো গেল কোথায়?” ভদ্রলোক ভক্তটির মুখের দিকে

তাকিয়ে প্রশ্ন করে, "কলকাতায় নতুন এসেছেন বুঝি? কোথায় যাবেন?" ভক্তটি বলে, "কালীঘাট।" ভদ্রলোক বলে, "ট্রামের একদিকেই দরজা থাকে। আপনারা যে উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছেন। ওপারে যান। যে কোন ট্রামে উঠবেন, কালীঘাটে পৌঁছে দেবে।" ঠাকুর এতক্ষণ ভক্তটির ভুল ভাঙার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি দুই-একবার বলেছেন, তবুও ওর হুঁশ হয়নি। কাউকে জিজ্ঞাসা করতেও ওর বাধছিল। ঠাকুর এবার বললেন, "আমার কথা শুনলি না তো, এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলি। দেখলি তো, জিজ্ঞেস করলে কখন সমাধান হয়ে যেত! আমরা এতক্ষণ পৌঁছে যেতাম।" ভক্তটি এবার বুঝলো। কি অসীম ধৈর্য ঠাকুরের!

একদিন ভক্তেরা ঠিক করলো, ঠাকুরকে গঙ্গাস্নান করাতে নিয়ে যাবে। কি একটা যেন যোগ ছিল সেদিন। গঙ্গায় সেদিন স্নানার্থীদের বেশ ভিড়। ঘাটেটেই তেল মাখিয়ে দেবার, কাপড়-জামা, জিনিসপত্র রাখবার জন্য লোক আছে। সমবয়সী কয়েকটি ভক্ত ঠাকুরকে নিয়ে গেছে গঙ্গার ঘাটে। তারা সবাই নতুন এসেছে কলকাতায় - সুতরাং গঙ্গার ঘাটে তেল মালিশ থেকে স্নান করিয়ে দেওয়া পর্যন্ত সবটারই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়। তাদের একান্ত ইচ্ছায় ঠাকুরও আপত্তি করলেন না। .... তৈলমর্দন পর্ব শেষ হ'ল। এবার স্নানের পালা। ঠাকুর ডুব দিচ্ছেন, সাহায্যকারী লোকটি ঠাকুরের কোমরে হাত দিচ্ছে। ঠাকুরের ট্যাঁকে ছিল সাতটি টাকা। সাহায্যকারীর নজর সেইদিকে। কোমরে হাত দিতেই ঠাকুর ওর সুবিধা করে দিলেন, যাতে টাকাটা বার করে নিতে পারে। পাড়ে উঠে লোকটিকে বললেন, "নিতে পেরেছ তো?" লোকটি কি বুঝলো বলা মুস্কিল। ফেরবার পথে ঠাকুর বললেন, "ওর টাকাটা নেবার আগ্রহ দেখে আমি কোমরটা ঢিলে করে দিলাম।" ভক্তেরা বললো, "ঠাকুর, ওকে টাকাটা দিয়ে দিলে?" ঠাকুর বললেন, "হ্যাঁ, দিয়েই দিলাম। মা গঙ্গাকে ওরা পবিত্র মনে করে। কত পূজা-আর্চা করতে দেখলাম। সেই পবিত্র গঙ্গার জলে নেমেও দেখলাম ও টাকার লোভ সামলাতে পারলো না। তাই ভাবলাম, টাকাটা নিয়ে যদি শান্তি পায়, নিয়ে যাক।" ভক্তেরা ঠাকুরের কথার মর্মার্থ বুঝে চুপ করে রইল।

কলকাতায় এসেছে, কালীঘাটের কালী দর্শন না করেই যাবে, - ভাবতেও ভক্তদের খারাপ লাগছে, অথচ তারা নিজেরা একলা যেতে চায় না। সঙ্গে ঠাকুরকে নিয়ে গেলে অনেক কিছু

জানতে পারবে; কিন্তু ঠাকুর তো কোন মন্দিরে বিশেষ যেতে চান না। কি করে তাঁকে রাজী করাবে? কালীঘাটের কালী নাকি বহুশত বছর আগেকার, পুরাতত্ত্ব হিসাবে একটা মূল্য আছে। সুতরাং ঠাকুরকে তারা পুরাকালের একটি মূর্তি দেখাতে নিয়ে যাবে বলে প্রস্তাব করলো। ঠাকুর আপত্তি করলেন না। দ্বারে দ্বারে দক্ষিণা দিয়ে তো ভিতরে ঢোকা হ'ল। ঠাকুর একটু আগে আগে যাচ্ছেন, ভক্তরা পিছিয়ে পড়েছে। ঠাকুর মূর্তির গায়ে হাত দিয়ে দেখছেন কিসের তৈরি। তারপর জিভে হাত দিয়ে পরীক্ষা করছেন সোনার কিনা। এমন সময় এক পাণ্ডা এসে বলছে, "মায়ের জিভে হাত দেওয়া - নির্বংশ হয়ে যাবে।" ঠাকুর প্রথমে বুঝতে পারেননি যে, তাঁকে উদ্দেশ্য করে পাণ্ডা এইরকম বলছে। সুতরাং তিনি একমনে পরীক্ষা করে চলেছেন। পাণ্ডার আক্রমণ এবার আর একটু তীব্র হ'ল, "সবাই মাকে পূজা দেয়, আর উনি মায়ের গায়ে হাত দিয়ে চলেছেন, জিভ ধরে টানছেন! এ কখনও ধর্মে সইবে না। নির্বংশ হয়ে যাবে।" পাশের একটি লোক ঠাকুরকে বললো, "ও আপনাকে বলছে।" এবার যেন ঠাকুরের খেয়াল হ'ল। পাণ্ডার দিকে তাকালেন তিনি। তখনও পাণ্ডা বলে চলেছে। ঠাকুর তখন পাণ্ডাকে এক ধমক দিলেন, "আমি নির্বংশ হই না হই, তাতে তোমাদের কি এসে যায়? তুমি যে বারবার মূর্তির গায়ে হাত দিচ্ছ, জিভে ঠোঙাগুলি ঠেকাচ্ছ, তাতে কিছু হচ্ছে না?" পাণ্ডা উত্তর দেয়, "আমি তো মায়ের পূজারী। আমার দোষ হবে কেন?" ঠাকুর বললেন, "কি রকম পূজারী তা তো বোঝাই যাচ্ছে..... এখনও তোমার বাকসংযমও হয়নি। একটা অন্ধ সংস্কারের বশে চলেছ। বলছো, মায়ের পূজা করছো, কিন্তু মা কোথায়? আমি তো দেখছি, একটি পাথরের মূর্তিকে সাজিয়ে লোককে দেখাচ্ছ। সোনার জিভ লাগিয়েছ, মূর্তিকে সাজিয়ে গুছিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছ। সত্যি যদি 'মা' চিন্তা করে যথার্থ পূজা করতে, তাহলে আরও সৌম্য, সংযত হতে.....।" এক মাড়োয়ারি ভদ্রলোক বেশ কিছুক্ষণ ধরে ঠাকুরের কথা শুনছিল, এবার ঠাকুরকে সেখানেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো। ভক্তেরা ইতিমধ্যে এগিয়ে এসেছে। ঠাকুর তাদের সঙ্গে মন্দির থেকে বের হলেন। এবার তিনি তাদের একচোট ধমকালেন, "এখানে আসবার আগে তোমাদের বলা উচিত ছিল এই মন্দিরের কথা। পুরাতত্ত্ব বলে পরীক্ষা না করে তাহলে আমি অন্যভাবে চলতুম।" ভক্তেরা মার্জনা চেয়ে বললো, "ঠাকুর আমাদের অপরাধ হয়ে গেছে। এটা পীঠস্থান বলে বিখ্যাত।[শ্রীবীরেন্দ্র বাণী] কথিত আছে, মহাদেব সতীর দেহ কাঁধে করে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন পাগলের মত। বিষ্ণু

দেখলেন, সৃষ্টি নষ্ট হতে চলেছে, তাই তিনি অন্তরাল থেকে চক্র দিয়ে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করে ফেলতে লাগলেন। সতীর অঙ্গ যেখানে যেখানে পড়েছে, সেখানেই এক একটি পীঠস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরকম একান্নটি খণ্ড পড়েছিল। কালীঘাটে নাকি একটি আঙ্গুল পড়েছিল।"

ঠাকুর বললেন, "শিবের মত এতবড় মহান যে স্ত্রীর শোকে উন্মত্ত হয়ে স্ত্রীর দেহ কাঁধে করে উন্মাদের মত ঘুরে বেড়াবেন, এটা যেমন অস্বাভাবিক, তেমনি অবাস্তব। আর বিষ্ণু যে এক মহীয়সী রমণীর দেহ খণ্ড করে কেটে ফেলবেন, সেটিও রুচিসম্পন্ন বলে মনে হয় না। এর ভিতরে আরও কোন অন্তর্নিহিত অর্থ আছে। কোন কিছু বোঝাবার প্রয়োজনবোধে সময়োপযোগী করে এই কাহিনীর মাধ্যমে সেটি বোঝানো হয়েছে। আজ সেটি বিকৃত হয়ে গেছে। কাহিনীর আসল উদ্দেশ্যটি ছেড়ে লোকে কাহিনী পূজা করছে। আসল অর্থ খুঁজে পায়নি। রূপকের মাধ্যমে একটি বিরাট সত্যকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এই কাহিনীর উদ্দেশ্য।"

ভক্ত – কি সেই মূল উদ্দেশ্য ঠাকুর, জানতে ইচ্ছে করে।

ঠাকুর – দেখ, একই অঙ্গের একান্নটি অংশের কথা বলছে। শিব সারা ভারত পরিক্রমা করেছিলেন দুর্গতিনাশ করে শান্তিস্থাপন করার উন্মাদনায়। বিষ্ণু শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম হস্তে অস্ত্রের সম্ভারে সুসজ্জিত। শিব হলেন মঙ্গলময় - শান্তি ও শুভর প্রতীক। পার্বতী হিমালয়ের কন্যা। উচ্চতার থেকে তাঁর জন্ম – তিনিই বসুমতী।

একান্নটি খণ্ডে একই অঙ্গের সেবা করা হচ্ছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক – একই অঙ্গের বিভিন্ন অংশ। সেই অঙ্গ বহন করছে সৎ, শুভ্র, পবিত্র ভাব। এই ভাবেই আসে শান্তি। বিশ্বপ্রকৃতির চক্র এই অঙ্গকে খণ্ড খণ্ড করে লয় করে দিতে চাইছে। তার সঙ্গে চলছে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম।

ভারতের সর্বত্র সেই একান্ন অংশের পূজাই চলছে - একই মায়ের, একই অঙ্গের পূজা। কেউ হাত, কেউ আঙ্গুল, কেউ পা পূজা করছে বা সেবা করছে। এর থেকে একটি মর্মার্থই দেখা

যাচ্ছে যে, একতাবদ্ধভাবে, এক হয়ে সেই মায়ের অর্থাৎ বসুমতীর সেবা করলে আসে শান্তি বা মঙ্গল। বিষ্ণু বা বিশ্বজগৎ বা বিশ্বপ্রকৃতিজাত জ্ঞান সেটাই প্রচার করছে। .....

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর একদিকে মোড় নিতে শুরু করেছে। আমেরিকান সৈন্য ইওরোপে প্রবেশ করবার সংকল্প করেছে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে যুদ্ধ ভীষণভাবে চলছে। ঠাকুর কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসেছেন। অনেক ভক্ত এসেছে তাঁকে দর্শন করতে। ঠাকুর নানা বিষয়ে আলাপ করছেন। এমন সময় হঠাৎ বলে উঠলেন, "সর্বনাশ, জাহাজটা তো ডুবে যাবে! দাঁড়া, দেখছি কি করা যায়।" ঠাকুর কি বলছেন, বুঝতে না পেরে সবাই ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠাকুর সকলের বিস্মিতভাব দেখে বললেন, "কালই টেলিগ্রাম আসবে। কয়েকদিন পরে চিঠি আসবে। তারপর ও নিজে এসে হাজির হবে। ভাববার কিছু নেই – এ যাত্রা বেঁচে গেল।" পরের দিন টেলিগ্রাম এল, "নিরাপদে আছি। অমিয়াংশু।"

অমিয়াংশু [অমিয়াংশু দাসগুপ্ত] নৌবাহিনীতে বড় অফিসার। চিঠি এল ক'দিন পরে। জানা গেল, তাদের যুদ্ধ-জাহাজ যখন ভারত মহাসাগরের দিকে যাচ্ছে, শত্রুপক্ষের সাবমেরিন থেকে টর্পেডো ছুঁড়ে মারল। জাহাজের তল ফুটো হয়ে গিয়ে তোড়ে জল উঠতে লাগল। বাঁচার কোন আশা নেই। অমিয়াংশু ঠাকুরকে স্মরণ করতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হ'ল, - জাহাজে যে লোহার পাতগুলো আছে, সেগুলো দিয়ে ফুটো বন্ধ করার চেষ্টা করলে কেমন হয়? এদিকে চারদিকে রেডিওতে 'এস্ ও এস্' পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনখানা জাহাজ ওদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে, খবর পাওয়া গেল। কিন্তু ততক্ষণ কি ওদের জাহাজ থাকবে? লোহার পাতগুলো ফেলে জল ওঠা বন্ধ করার চেষ্টা করতে লাগল। কিছুক্ষণ চেষ্টা করবার পর দেখলো, আশ্চর্যভাবে জল ওঠা কমে যাচ্ছে। সাধারণত: এভাবে জল বন্ধ করা সম্ভব নয়। কারণ বাইরের জলের চাপ কোন কিছুই মানবে না। জল ঢোকার বেগ দেখে আশা হ'ল যে, কিছুক্ষণ ওরা টিকে থাকতে পারবে। অমিয়াংশু একমনে ঠাকুরকে স্মরণ করছে। এর মধ্যে দূর থেকে একটা জাহাজ দেখতে পেল। ক্রমে তিনটে জাহাজ এসে উপস্থিত হ'ল এবং সবাইকে উদ্ধার করে নিয়ে চললো। পরিত্যক্ত জাহাজটির অবস্থা তখন খুবই সঙ্গীন – একদিকে টাল খেয়ে পড়েছে। অমিয়াংশু উপলব্ধি করলো যে, অল্পের জন্যে তারা

আজ সলিল-সমাধি থেকে বেঁচে গেল। ...কয়েকদিন পরেই অমিয়াংশু কলকাতায় এসে উপস্থিত। ঠাকুরের পা জড়িয়ে কাঁদতে শুরু করলো, "ঠাকুর, তুমি না বাঁচালে আমরা কিছুতেই বাঁচতাম না। আমাদের উদ্ধারকারী জাহাজগুলি যেখানে ছিল, সেখান থেকে আসতে আসতেই আমাদের জাহাজ ডুবে যেত। কি বুদ্ধি হ'ল, লোহার পাতগুলো ফুটোর দিকে ফেলতে লাগলাম। আশ্চর্যভাবে জলের তোড় কমে গেল। ওভাবে পাত ফেলে জল আটকানো অসম্ভব। কিন্তু তোমার কৃপায় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। আমরা যখন জাহাজটা ছেড়ে অন্য জাহাজে উঠলাম, তখনই কয়েক মিনিটের মধ্যে জাহাজটি এক কাত হয়ে পড়লো। তারপর আর বেশিক্ষণ তাকে দেখা যায়নি। তুমি না বাঁচালে আজ সশরীরে আসতে পারতাম না। আমার সহকর্মীরাও আশ্চর্য হয়ে গেছে।"

ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, "দেখলে তো আমাকে কত খাটতে হয়।" ...

ঠাকুর ঢাকাতে ফিরে এসেছেন। ঢাকাতে দর্শন দীক্ষা দিয়ে যখন অবসর পেতেন, ভক্তদের ধ্যানে বসাতেন, জপ করতে বলতেন। কোন কোন কীর্তনীয়া ভক্ত এসে মাঝে মাঝে কীর্তন করতো ঠিকই, কিন্তু ভক্তদের জপ ধ্যান করার বিষয়েই বেশি জোর দিতেন। নিজেও বেশি বিশ্রাম করতেন না, ভক্তদেরও শুয়ে বেশি সময় নষ্ট করতে দিতেন না। গভীর রাত্রি পর্যন্ত তারা জপ-ধ্যানে মগ্ন থাকতো। জপের মধ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত দর্শন হতো বলে ভক্তরাও খুব উৎসাহ পেত।

একদিন এক ভক্ত [বিনয় পাল] ধ্যানে বসে দেখতে পেল – ক্রমশ: তার শরীর হাল্কা হয়ে যাচ্ছে। সে যেন ঠাকুরের পায়ের আঙ্গুল ধরে আছে। কিছুক্ষণ পরে মনে হ'ল, সে আর ধ্যানে বসে নেই, ঠাকুরের সঙ্গে চলেছে মহাকাশের গভীরে, ঘন কালো আলো-আঁধারির ভিতর দিয়ে পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে বহু দূরে। কিছুক্ষণ পরে তারা একটা অজানা গ্রহে এসে উপস্থিত হ'ল। সামনে দেখলো অনেক মৎস্যকন্যা শিস দিয়ে দিয়ে গানের ছন্দে কথা বলছে। নানারকম অদ্ভুত ফলের গাছ - ফলগুলি স্বাদে-সোয়াদে অতি উপাদেয়। ভক্তটি ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে লাগল সেই অদ্ভুত গ্রহে। ঘুরতে ঘুরতে তার ভীষণ খিদে পেয়ে গেল। মনে হ'ল, ভাল খাবার পেলে হ'ত। আশ্চর্য! কোথা থেকে কিভাবে এল বুঝতে পারে না - দেখে সামনেই খাবার ভর্ত্তি থালা....। এক জায়গায় অনেক মহান বসে আছেন। ঠাকুর গিয়ে সেখানে বসলেন, অনেক কথা বললেন। ভক্ত তার

একবর্ণও বুঝলো না। কথাবার্তা শেষ করে ঠাকুর উঠে পড়লেন, ভক্তটিকে বললেন, "চল, আমরা ফিরে যাই।" ফেরার সময় ভক্ত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছে – গাঢ় নীল, প্রায় কৃষ্ণবর্ণ মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে সে চলেছে ঠাকুরের পায়ের আঙ্গুল ধরে। চলেছে তো চলেছেই শূন্যের আর শেষ হয় না। কোথাও কিছু দেখা যায় না, শুধু ফাঁকা আর ফাঁকা। গাঢ় অন্ধকারের ভিতর দিয়ে চলেছে। কোন আলো নেই, তবু যেন এ আঁধারকে অন্ধকার মনে হচ্ছে না। তার মধ্যে রয়েছে এক অদ্ভুত স্বচ্ছতা। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল এই স্বচ্ছ কালো অন্ধকারের মধ্যে। তারপর ধীরে ধীরে নীল আকাশের স্বচ্ছতা ফুটে উঠতে লাগল। এতক্ষণ শরীর যে আছে, মনেই হচ্ছিল না। ধীরে ধীরে শরীরের ভার ফিরে আসতে লাগলো। ভক্ত ফিরে এল পৃথিবীর বুকে। চোখ মেলে তাকাতেই ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, "কিরে, কেমন লাগলো?" ভক্ত জবাব দিল, "অদ্ভুত সুন্দর!"

কিছুদিন ধরে এক বৃদ্ধা প্রায়ই এসে ঠাকুরকে ধরে – তার চোখ ভাল করে দিতে হবে। রোজই তিনি 'আর একদিন এস' বলে তাকে ফিরিয়ে দেন। বৃদ্ধাও নাছোড়বান্দা। সে রোজই আসে, কান্নাকাটি করে, "ঠাকুর, আমার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দাও। আমি যেন একটু দেখতে পাই।" একদিন বিকালে ঠাকুর এক ভক্তকে বললেন, "একটা খবরের কাগজ আর একটা মোমবাতি এনে রাখ।"

বিকালে প্রচুর লোক এসেছে। ঘর প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। ঠাকুর আলাপ করছেন। ক্রমে গভীর তত্ত্ব নিয়ে আলাপ শুরু করলেন। ভক্তেরা নিবিষ্টচিত্তে শুনে যাচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, "মনের একাগ্রতার দ্বারা সবকিছুই করা সম্ভব। সূর্যের রশ্মি ভারী কাঁচের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেলে যেমন তার তাপ বাড়িয়ে যে কোন দাহ্য পদার্থতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া যায়, তেমনি মনের একাগ্রতা দিয়ে অসাধ্যসাধন করা যায়। স্বপ্নের মধ্যে মনের একাগ্রতা এমন এক স্তরে এসে পৌঁছায় যে, তখন যা চিন্তা করা যায়, তাই হয়ে যায়। এইজন্য স্বপ্নের মধ্যে আকাশে উড়ে যাওয়া, জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া সহজ বলে মনে হয়। জাগ্রত অবস্থায় নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব এসে ঘিরে ধরে। সুতরাং সেই একাগ্রতা থাকে না।" ...আলাপের মাঝখানে সেই বৃদ্ধাও এসেছে এবং মাঝে মাঝে বলে উঠছে, "ঠাকুর, আমি ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে গেলাম কেন? আমি অনেকদিন ধরে ঘুরছি। আজ আমাকে দৃষ্টি

ফিরিয়ে দিতেই হবে।" আলাপের মাঝখানে বাধা সৃষ্টি করার জন্য সকলেই মনে মনে বিরক্ত হচ্ছে। কিন্তু পাছে আলাপ বন্ধ হয়ে যায়, তাই কেউ কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না। ঠাকুরের কাছে যেতে পারলে হয়তো বৃদ্ধা শান্ত হবে ভেবে সবাই পথ করে এগিয়ে দিয়েছে তাকে। বৃদ্ধা সুযোগ পেয়ে ঠাকুরের পা চেপে ধরে বলতে শুরু করে, "আজ আর তোমাকে ছাড়ছি না। আজ আমার চোখ ভাল করে দিতেই হবে।" আলাপে ক্রমাগত বাধা সৃষ্টি করতে লাগল বৃদ্ধা। বিরক্ত হয়ে ঠাকুর সজোরে পা ছাড়িয়ে নিলেন। বৃদ্ধা ছিটকে পড়লো। আলাপ বন্ধ হয়ে গেল। ঠাকুর একজনকে বললেন, "দরজা জানালা সব বন্ধ করে দাও আর মোমবাতি জ্বালাও।" এবার তিনি বৃদ্ধাকে ডাকলেন। খবরের কাগজটা ওর হাতে দিয়ে বললেন, "পড়।" ঠাকুরের কথায় বৃদ্ধা কেঁদে ফেললো, বললো, "বাবা আমি কি পড়তে পারি? আমি তো চোখেই দেখি না।" ঠাকুর বৃদ্ধাকে এক ধমক দিলেন, "পড় বলছি।" ধমক খেয়ে বৃদ্ধা কাগজটা তুলে ধরলো, তারপর গড় গড় করে পড়ে চললো। বৃদ্ধা এবার আনন্দের আতিশয্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে লুটিয়ে পড়লো। উপস্থিত সকলে একটি অত্যাশ্চর্য বিভূতি দেখে হতবাক হয়ে গেল। ঠাকুর বৃদ্ধাকে বললেন, "হয়েছে তো, এবার যা।" জিজ্ঞাসু ভক্তদের বললেন, "এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ওর দৃষ্টি ফিরে পাবার জন্য তীব্র ইচ্ছা জেগেছিল। ওর সেই একাগ্রতার সঙ্গে আমার ইচ্ছাটা একযোগে এই অসম্ভব সম্ভব করলো। যে শক্তি তোমাদের মধ্যে আছে, সেই শক্তিটাকেই বাড়াতে হবে। তবে আর অসম্ভব বলে কিছু থাকবে না।"

বহু লোক দর্শন করতে আসছে। এরই মধ্যে একদিন একটি মহিলা এসে চিৎকার করে কেঁদে ঠাকুরকে বলছে, "আমার ছেলেটি মারা যাচ্ছে, তুমি বাঁচাও [শ্রীবীরেন্দ্র বাণী] ।" ঠাকুর তাকে অপেক্ষা করতে বললেন। সবাই চলে গেলে মহিলাটি বললো, "আমার ছেলেকে হাসপাতাল থেকে ফেরত দিয়েছে, বলছে, 'বাঁচবে না। নিয়ে যাও।' মায়ের মন তো, তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি, বাবা।" ঠাকুর বললেন, "ঠিক আছে। দেখতে যাব।" ...একটি গাড়ী করে গোপীবাগ গেলেন। সঙ্গে দুই-তিন জন ভক্ত। ঠাকুরকে ঘরে ঢুকতে দেখেই রোগী রেগে গেল, "এই বালক কি করবে?" ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, "মানুষটা বড় হলে কি হবে? মাত্রা ছোট হলে কি ওষুধে কাজ হয় না? দেখা যাক না," বলেই ঠাকুর রোগীর কাছে গিয়ে বসে পড়লেন। সে যতই চটছে,

ঠাকুর ততই হাসছেন আর বলছেন, "একেই বলে রোগী।" ঠাকুর বললেন, "দেখ, এই যে উপর দিয়ে উড়োজাহাজ যায়, মানচিত্রে নিয়ে যাচ্ছে। দেশ তো পরে গিয়ে দেখছে। ঐ নিশানায় নিশানায় গিয়ে যার যার গন্তব্যস্থলে পৌঁছচ্ছে।" রোগীকে লক্ষ্য করে বললেন, "তুমি কি ভাল হতে চাও?" রোগী বলছে, "আপনি আমায় কী করে ভাল করবেন? আমাকে হাসপাতাল থেকে ফেরত দিয়েছে।" ঠাকুর বললেন, "রোগ ধরতে পেরেছে কি না, সে বিষয় তো দেখতে হবে। রোগ যদি ধরতে পারতো, তাহলে ঠিক ঠিক সারাতে পারতো। রোগনির্ণয় করাতে ভুল হলেই এরকম হয়। তাতে তাদের দক্ষতা নেই একথা বোঝা যায় না। রোগনির্ণয়ের ভুলের জন্য অনেক সময়ে অনেকে দুর্ভোগে পড়েন। রোগটা কি, আমি একটু দেখি।" রোগী তাকিয়ে আছে আর বকাবকি করছে। ঠাকুর তাঁর ভক্তদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখবে, এই যে চতুর্দিকে মানুষ মান-অভিমান, নিন্দাচর্চা করে, এ হলো আর এক রোগীর বকা। সুতরাং ডাক্তাররা চটে না। আর ওদের গালিতে মহানরা গুরুত্ব দেন না; কারণ ওগুলো অজ্ঞানতা-প্রসূত। সুতরাং ক্ষমা করাই উচিত।" রোগী, রোগীর মা - সবার সঙ্গেই ঠাকুর আলাপ করছেন। রোগীকে বললেন, "আমি যে ওষুধ দেব, খেতে পারবে তো?" রোগী বলে, "রোগ সারলে, খেতে পারব না কেন?" ঠাকুর এক গ্লাস জল চাইলেন। ওর গায়ে জল ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, "যাও, তোমার রোগ ধুয়ে পরিষ্কার করা হ'ল। চারদিন পর তুমি দেখবে, বেশ হাঁটতে পারছো। তখন গিয়ে না হয় আর কয়েকটি গালি দিয়ে এসো।" রোগীর আত্মীয়েরা টাকা দিতে চাইল। ঠাকুর বললেন, "ওকে এই টাকা দিয়ে ফলটল কিনে খাইও। আমার আর 'ভিজিটে'র প্রয়োজন হবে না।" তিনি গাড়ীভাড়াও নিলেন না। ফেরার পথে একজন বললো, "গাড়ীভাড়াটা নিলে মন্দ হ'ত না।" ঠাকুর বললেন, "গাড়ীভাড়া নিলে আবার তাড়াতাড়ি যাবার ইচ্ছা হবে, বসার ইচ্ছা হবে। যত ছেড়ে দেওয়া যায়, ততই ভাল। এঁটে যত বাঁধবে, ততই কষবে।" ভক্তটি আর কিছু বললো না।

দিনচারেক পর ভদ্রলোক সুস্থ হয়ে অনেক ফল নিয়ে এসে উপস্থিত। ঠাকুরের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। আগের ব্যবহারের কথা স্মরণ করে ক্ষমা চাইছে। ঠাকুর একটু রগড় করে বললেন, "এও যে একজাতীয় গালি দিচ্ছো।" বুঝতে না পেরে সবাই অবাক হয়ে ঠাকুরের দিকে

তাকিয়ে আছে। ঠাকুর বললেন, "এটা হ'ল সুস্থতার গালি। অসুস্থতার সময় ছিল এক রোগ। তখনকার জন্য ওটাই প্রাপ্য। আর সুস্থতার সময়ে এ জাতীয় প্রাপ্য। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপের বিকাশ বা পরিচয় মাত্র। অবস্থা একই। জিহ্বা একই - বিভিন্ন বস্তুতে বিভিন্ন স্বাদের পরিচয় দেওয়া মাত্র। মুখ একটি - ক্ষণে হাসি, ক্ষণে কান্না, অবস্থা ভেদে। তাই আমি তোমার কোনটাই নিচ্ছি না। গালিও নিইনি, প্রশংসাও নিচ্ছি না। ক্ষমার কোন কথাই আসছে না, এখানে খুশি অখুশির কথাও আসছে না।" তারপর ঠাকুর বললেন, "ফলগুলো তোমরা সব বসে খেয়ে ফেল, আমি দেখি।" প্রসাদ করে দেওয়ার জন্য ভক্তেরা বললো, ঠাকুর ডালাখানা ছুঁয়ে দিলেন। রোগী [অমূল্য বোস, ঢাকা] পরদিন এসে দীক্ষা নিল।

ঠাকুর এসেছেন নারায়ণগঞ্জের এক বাড়িতে। পাশেই আচার্যদের বাড়ি। তাঁর দর্শনের অভিলাষে বহু লোক আসছে। অনেকে দীক্ষাও নিচ্ছে। আচার্যদের মা দুই-এক বছর হ'ল স্বামী হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছে। কি করে সংসার চালাবেন, কি করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করবেন, - সেই দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। পাশের বাড়িতে বালক ঠাকুর এসেছেন, তাঁকে দর্শন করে এসেছেন, দীক্ষা নেওয়ার খুব ইচ্ছা। কিন্তু তাঁদের যে কুলগুরু আছেন, তাঁর অনুমতি বিনা কি দীক্ষাগ্রহণ করতে পারবেন? অন্য এক ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিতে চান জানলে, কুলগুরু হয়তো অনুমতি দেবেন না; হয়তো বা তিনি রাগ করবেন। এইরকম নানা দুশ্চিন্তা এসে তাঁকে ঘিরে ধরে। এর মধ্যে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছেন জানেন না। স্বপ্ন দেখছেন যে, তিনি পুকুর ঘাটে গেছেন। সামনের একটা গাছের তলায় বালক ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন। অদ্ভুত এক জ্যোতি বের হচ্ছে তাঁর দেহ থেকে। বালক ঠাকুর বলছেন, "অত ভাবছিস কেন? আমি তো আছি। তোর সব সমস্যা মিটে যাবে। সকালে স্নান করে আসিস।" এক মুহূর্তে মহিলার দ্বন্দ্বসংশয় কেটে গেল। ঘুম ভাঙ্গতেই ঠিক করলেন যে, তিনি বালক ঠাকুরের কাছেই দীক্ষা নেবেন। স্নান করে বালক ঠাকুরের কাছে যেতেই তিনি বললেন, "কী, তোমার সংশয় দূর হয়েছে তো? তবে এবার দীক্ষাটা নিয়ে যাও।" পরে বললেন, "এরপর যখন আসবো, তুমিই আমার জন্য রান্না করে দেবে।" [পরবর্তীকালে আচার্য্য পরিবারের সবাই একবাক্যে বলেন, - অলক্ষ্যে ঠাকুর তাঁদের সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন এবং বহু

বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন আশ্চর্যভাবে। এইরকম শুধু একটি পরিবারই নয়, হাজার হাজার পরিবার তিনি রক্ষা করেছেন এবং আজও রক্ষা করে চলেছেন।]

কিছুদিন পরের কথা। ঠাকুর ঢাকাতেই আছেন। ঢাকার বাড়িতে একজন দীক্ষা নিতে এসেছে। কিন্তু সে শুনতে পায় না; একেবারে কালা। ঠাকুর তাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করলেন। সে উত্তর দিচ্ছে না দেখে - বললেন, "কি, কথা বলছ না কেন?" সে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর কানে আঙ্গুল দেখিয়ে সে বুঝিয়ে দিল যে, সে কালা। ঠাকুর তার কানে মূলমন্ত্র দিয়ে দিলেন। মন্ত্রটি সে শুনতে পেল। তখন সে বললো, "মন্ত্রটা তো শুনতে পেলাম। কিন্তু প্রভুর কথা তো শুনতে পাচ্ছি না।" ঠাকুর বললেন, "বেশ, এখন তুমি বসে বসে প্রভুর কথা শোন।" দেখা গেল - এরপর থেকে সে ঠাকুরের কথা সবই শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু আর কারও কথা শুনতে পাচ্ছে না। ঠাকুর বলতে লাগলেন, "একদিন কে যেন আমার এক শিষ্যকে বলেছিল – তোদের ঠাকুর বশীকরণ না কি করে! একে দেখলে তো তোরা এই কথাই বলবি? বধির আমার কথা শুনছে, অথচ তোদের কথা একেবারে শুনতে পাচ্ছে না। ওকে আমি 'হিপনোটাইজ' করে রেখেছি! এটা মন্দ কি? একটা সাময়িক প্রলেপের কাজ করে তো! অথচ সেই ব্যক্তি এসে যখন আমায় দেখলো, তখন সে কি বলে জানিস? - 'এই বাচ্চা কি করে 'হিপনোটিজম' জানবে? যা:, ওরা এসে মিথ্যা কথা বলেছে। এ মনে হয় জন্মান্তরিক সাধু।' আমি বললাম, 'আপনারা জন্মান্তরিক মহাসাধু।' ওরা হাসতে লাগলো। আমি বললাম, "আপনারা দেখেই সাধু অসাধু চিনতে পেরেছেন কি না - তাই আমি ওকথা বললাম।"

বধির লোকটির কথা ঠাকুর বললেন, "ডাক্তার ওকে নাকি বলেছে পরীক্ষা করে যে, ও আর ভাল হবে না। যে পর্যন্ত পেয়েছে সে পর্যন্ত ঠিকই বলেছে। আমি যে পর্যন্ত পাচ্ছি, গিয়ে দেখলাম ঠিক আছে। মাঝখানে কয়েক পর্দার গোলমাল খালি।"

ঠাকুর তারপর বললেন যে, ওকে শোনাবার উপায় একটা আছে। একজনকে ঠাকুরের আঙ্গুল ধরতে হবে, আর একজনকে ঐ বধিরের আঙ্গুল ধরতে হবে। এমন ভাবে দশ-বারো জন একত্রে দাঁড়াবে যাতে ঠাকুরের সঙ্গে বধিরের একটা যোগাযোগ হয়ে যায়। ঠাকুরের কথামত সবাই

একত্রে দাঁড়ালো এবং বধিরের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলো। ও ঠিক শুনতে পাচ্ছে এবং উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। বধির লোকটি খুব খুশি, তখনই সে মনে করছে যে, সে ভাল হয়ে গেছে। তখন ঠাকুর আবার বললেন, "দেখলি তো, যোগাযোগে থাকলে ঠিক সাড়া দেয়। তবে যোগাযোগ রাখতে হয়।" বধির ক্রমশ: শুনতে পেতে লাগলো এবং অনেকটা ভাল হয়ে গেল।[1] [শ্রীবীরেন্দ্র বাণী]

বন্ধুর নানারকম সমস্যার কথা শুনে গৌর [গৌর পাল] একদিন বললো, "চল, আমার ঠাকুরের কাছে, তোমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।" বন্ধু [যতীন দাস - ঢাকা, কাপ্তান বাজার] 'আসানুল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের' ছাত্র। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। যে কোন কারণেই হোক পড়াশুনা তেমন হয়নি। আর এত অল্প সময়ের মধ্যে পড়াশুনা করে ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে পাশ করা তো সহজ নয়। বিরাট সমস্যা। কি করবে? এক বছর নষ্ট করাও তার পক্ষে অসুবিধা। সুতরাং সমস্যার বোঝা নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে সে গেল বালক ঠাকুরের কাছে। তার সব সমস্যার কথা শুনে ঠাকুর শুধু একটি কথাই বললেন, "মইরা বাইচ্যা পরীক্ষা দে।" সাধারণ অর্থে এর মানে সে যা বুঝলো, তা হ'ল যে কোন উপায়েই হোক তাকে পরীক্ষা দিতে হবে এবং তার জন্য উঠে পড়ে তাকে পড়াশুনা করতে হবে। সেদিন সে বড় আশা নিয়ে বিদায় নিল এবং পরে একদিন গিয়ে দীক্ষা নিয়ে এল। মন দিয়ে পড়াশুনা করতে শুরু করেছে। কিন্তু আশ্চর্য বিধিলিপি! হঠাৎ সে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হ'ল। অবস্থা ক্রমশ: জটিল হয়ে উঠলো, বাঁচার আশা নেই। অবশেষে একদিন ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন। তাকে বাইরে বার করা হয়েছে। মৃতদেহ দাহ করবার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে, এমন সময় তার জ্ঞান ফিরে এল এবং ধীরে ধীরে সে সুস্থ হয়ে উঠলো। জ্ঞান ফিরে আসার পর সে বললো, কে যেন তার মুখে মধু ঢেলে দিলেন এবং তারপরই সে জ্ঞান ফিরে পেল। ধীরে ধীরে সে আরোগ্যলাভ করলো। ঠাকুরের নির্দেশমত যথাসময়ে সে পরীক্ষাও দিল এবং সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করে সাব-ওভারসীয়ারের চাকরী পেল। কেউ সেদিন ভাবতে পারেনি যে 'মইরা বাইচ্যা পরীক্ষা দে' কথাটির সম্পূর্ণ আক্ষরিক অর্থে ঠাকুর ব্যবহার করেছেন।

ঠাকুর কয়েকদিনের জন্য দোগাছি গেছেন। একদিন দোগাছির বাড়িতে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে ঠাকুর বিনয় পালকে জপ করতে বলেছেন। ঠাকুরও সামনে বসে আছেন। বিনয়

পাল [দোগাছির 'পালে'র বাড়ির ছেলে বিনয়। ঠাকুর তাকে 'বিনয়দা' বলে ডাকতেন] কে বললেন, "কোন শব্দ শুনলে দরজা খুলে শব্দ অনুসরণ করে যাবি, আর যাকে দেখবি, জাপটে ধরবি।" ঠাকুরও ধ্যানে বসলেন। বিনয় পাল জপ করে চলেছে। এমন সময়ে ছাদের উপর ধুপ-ধাপ শব্দ শুনতে পেল। বিনয় পাল চোখ মেলে দেখে ঠাকুর ঘরে নেই। দরজা জানালা ঠিকই বন্ধ আছে। দরজা খুলে শব্দ অনুসরণ করে ছাদে পৌঁছে দেখে, ছাদের উপর জীবন্ত কালীমূর্তি। মা কালীর মূর্তি বা মা কালীর ছবি যতই ভাল লাগুক না কেন, মা কালীর প্রতি যত শ্রদ্ধাভক্তি থাক না কেন, সামনে জীবন্ত কালীমূর্তি দেখে ভয়ে তার প্রাণ শুকিয়ে গেল। ঠাকুরের নির্দেশ পালন করা দূরের কথা, ভয়ে ভীতিতে ঠাকুরের নির্দেশের কথা ভুলে তাড়াতাড়ি সে নীচের ঘরে নেমে এল। নীচে এসে মনে পড়লো ঠাকুরের নির্দেশের কথা। সে তখনই আবার ছাদে গিয়ে দেখলো, কালী-মা একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর জ্ঞাননেত্র দিয়ে উজ্জ্বল আলো বের হচ্ছে। রক্তমাখা জিহ্বা, গলায় মুণ্ডমালা, এক হাতে ছিন্ন মুণ্ড, আর এক হাতে খড়্গ। ঠাকুরের নির্দেশ স্মরণ করে এবার ভয়ভীতি দূরে সরিয়ে দিয়ে কালী-মাকে জাপটে ধরলো। দেখে, কালী-মা তো নেই, ঠাকুরকেই সে জাপটে ধরেছে। ঠাকুর হাসছেন আর বলছেন, "কিরে, হ'ল তো?" বিনয় পাল বেশ কিছুদিন ধরে ঠাকুরের অলৌকিক শক্তি প্রত্যক্ষ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। ঠাকুরকেও দুই একবার বলেছে। সেদিন অযাচিতভাবেই বিনয় পালের অভিলাষ পূরণ করলেন। "হ্যাঁ গোঁসাই, যা চেয়েছিলাম, সবটাই পেয়েছি", বিনয় পাল উত্তর দেয়। ঠাকুর বললেন, "আমার কাছে কখনও কিছু চাইবি না, বুঝলি?" বিনয় ঘাড় নেড়ে বলে, "আচ্ছা গোঁসাই।"

কিছুদিন পরের কথা। ঠাকুর উজানচর-কৃষ্ণনগরে কয়েকদিন আছেন। ঠাকুরের এক ভক্ত একদিন ঠাকুরের কাছে এসে কেঁদে পড়লো, 'গোঁসাই, আমার চোর নামটা ঘুচিয়ে দাও। সত্যি বললেও কেউ আমাকে বিশ্বাস করে না। সকলেই আমাকে দেখলে এড়িয়ে যেতে যায়। আমি কি ভালভাবে বাঁচতে পারি না?' ঠাকুর বললেন, "ঠিক আছে। তুই যখন যা অপরাধ করবি, আমাকে জানাবি। আর যে যে নির্দেশ দিই, মেনে চলবি। তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।" এরপর একদিন সেই লোকটি জমিদার বাড়ি থেকে রাত্রে একটা গরু চুরি করে এনেছে। ঠাকুরের নির্দেশ মনে পড়ায়

গরুটার কথা জানাতে গেল ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর সব শুনে বললেন, "এক কাজ কর। গরুটা এখনি জমিদারবাবুর কাছে নিয়ে যা। জমিদারবাবুর সঙ্গে দেখা করে বলবি যে, গতকাল ভোর রাত্রে গরুটা তোর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ঘাস খাচ্ছিল। তুই দেখেই জমিদারবাবুর গরু বলে চিনতে পেরেছিস। তাই গরুটাকে নিয়ে এসেছিস।" গরুটা বিক্রী করে দেওয়ার লোভ সামলে সে ঠাকুরের নির্দেশমত গরুটাকে জমিদার বাড়ি নিয়ে গেল। জমিদারবাবু তো চোরকে ওইভাবে দেখে অবাক। যে একটা হাতুড়ি বাটালির লোভ সামলাতে পারে না, সে একটা গরু হাতে পেয়ে সেটাকে দিয়ে দিতে এসেছে! খুব খুশি হয়ে জমিদারবাবু বলেন, "ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে তোর তো বিরাট উন্নতি হয়েছে! তুই তো ভাল হয়ে গেছিস।" ব্যাপারটি চারিদিকে রটে গেল। গ্রামের সবাই ওকে যেন একটু অন্য চোখে দেখতে লাগল!

আজকাল অনেকেই ভক্ত চোরটিকে বিশ্বাস করে। একদিন বাড়ির কাজের জন্য এক ভদ্রলোকের কিছু মজদুর দরকার। তিনি ওকে ডেকে বলেন, "আমাকে কিছু মজদুর যোগাড় করে দিতে পার? জমিটা মাটি ফেলে একটু উঁচু করতে হবে।" ভক্তটি বলে, "ঠিক আছে। আমি লোক ঠিক করে দেব।" দর কষাকষি করে ছয় আনা মজুরি ঠিক হ'ল। ভক্তটি এসে ঠাকুরকে জানাল এই কাজটির কথা। ঠাকুর বললেন, "কামলাদের কত করে দিস?" ভক্তটি উত্তর দেয়, "কামলাদের দিই চার আনা, আর আমার থাকে দু'আনা।" ঠাকুর বললেন, "বেশ, তবে কামলাদের কাজে লাগিয়ে দে। আর ভদ্রলোককে বলবি যে, আপনার বাড়ি আর আমার বাড়ি আমি তফাৎ করে ভাবতে পারলুম না। মনে হ'ল, যেন আমার বাড়িরই কাজ। তাই প্রতি কামলায় আমি যে দু'আনা করে নিতাম, সেটা আর নেব না। আপনি কামলা প্রতি চার আনা করেই দেবেন। আপনার সামনেই ওদের পয়সাটা দিয়ে দেব। আমার লাভটা ছেড়ে দেব।" ঠাকুরের নির্দেশমত ভক্তটি কাজ করে গেল। ফলে ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বললো, "ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তোমার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। তুমি এখন সত্যি নির্লোভ।" মুখে মুখে ভক্তটির কথা গ্রামে রটে গেল। সবাই তার প্রশংসায় তখন পঞ্চমুখ।

ভক্ত চোরটির এখন সমাজে বেশ একটা নাম হয়ে গেছে। সবাই আপদে- বিপদে তাকে ডাকে। একজনের মেয়ের বিয়ে - চার মণ দুধ লাগবে। ভক্তটির ডাক পড়লো, "দেখ, আমার মেয়ের বিয়ে, দুধ তো লাগবে। চার মণ দুধ যোগাড় করে দিতে পারবে?" ভক্তটি রাজী হয়ে গেল, "আপনার মেয়ের বিয়ে। আমি দুধ নিশ্চয়ই এনে দেব।" তারপরই সে ছুটলো ঠাকুরের কাছে, "গোঁসাই, মেয়ের বিয়ে, তাই আমাকে চার মণ দুধ যোগাড় করে দিতে বলেছে।" ঠাকুর বললেন, "শোন, তুই এক মণ দুধের দাম নিবি না। বলবি যে, তুই এক মণ দুধ পেতিস একজনের কাছে। সেই দুধটা তুই ওর মেয়ের বিয়েতে দিয়ে দিচ্ছিস। ওটার জন্য আর পয়সা দিতে হবে না।" সত্যিই সে একজনের কাছে এক মণ দুধ পেত। এবার ঠাকুরের নির্দেশমত ভক্তটি চার মণ দুধ পৌঁছে দিয়ে বললো, 'এক মণ দুধ আমি একজনের কাছে পেতাম। ওটার আর পয়সা দিতে হবে না। মেয়ে তো আমারও। তাই ওর বিয়েতে ওটা দিলাম। আপনি শুধু তিন মণের দাম দেবেন।' ওর কথা শুনে সাধু সাধু রব উঠে গেল।

ভক্তটির উপর এখন মানুষের এত বিশ্বাস যে, একজন ওকে রাতে পাহারা দিতে নিযুক্ত করতে চায়। ঠাকুরকে এসে জানাতে তিনি বললেন, "ভালই তো, কর না কিছুদিন।" পাহারা দিতে শুরু করেছে। একদিন সকালে তার মালিককে ভক্তটি বলে, "কাল রাতে আমার আগেকার সাকরেদ এক চোর এসেছিল। সে জানে না যে, আমি চুরি ছেড়ে দিয়েছি। আমি তাকে বারণ করে দিলাম, – এখানে কিছু করিস না।"

ভক্তটি যা যা ঘটে সব ঠাকুরকে এসে জানায়। ঠাকুরও তাকে উপযুক্ত নির্দেশ দিয়ে দেন। এবার একদিন এসে বললো, "গোঁসাই, চোর নাম তো আমার ঘুচিয়ে দিলে। লোকে এখন উল্টে আমাকে সাধু বলে। তা তো হ'ল। কিন্তু এখন আমি খাব কি? একটা কিছু তো করতে হবে।" ঠাকুর বললেন, "খাবার ভাবনা তোর ভাবতে হবে না। তোর খাওয়া ঠিক জুটে যাবে। আর আগের পথ মাড়াস না। এক কাজ কর – তুই কাঁচা মালের ব্যবসা শুরু কর।"

এইভাবে ভক্তটির জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এসে গেল। [এইরকম একটি দুটি নয়, বহু ঘটনা আছে। কত সমাজবিরোধী মানুষ শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয়ে এসে যে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তার বিবরণ দিতে গেলে হাজার হাজার পাতা শেষ হয়ে যাবে, তবু সব বলা হবে না।]

কিছুদিন পরের কথা। মহানন্দের কোন কারণে অভিমান হয়েছে। কয়েকদিন ঠাকুরের কাছে যায় না। কারণটা অবশ্য তেমন কিছু নয়; কিন্তু ওর মনে লেগেছে। ঠাকুরের কাছে যাচ্ছিল, হঠাৎ সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে একটা হাত ফ্র্যাকচার (ভেঙে) হয়ে গেছে। ডাক্তার তখনকার মত একটা অস্থায়ী ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে। সামনের সপ্তাহে প্লাস্টার করে দেবে। প্লাস্টার নাকি তিন সপ্তাহ থেকে এক মাস রাখতে হবে। মহানন্দের অভিমান হয়েছে, - ঠাকুর কেন দেখলেন না? কেন তার হাত ভেঙে গেল? মহানন্দ কয়েকদিন আসছে না দেখে ঠাকুর তাকে ডেকে পাঠালেন। ঠাকুর ভোলা গিরির আশ্রমের ঘাটলার পাড়ে বসে আলাপ করছেন, সঙ্গে কয়েকজন ভক্ত-শিষ্য। এমন সময় মহানন্দ এল। ঠাকুর তাকে ইশারায় বসতে বললেন। ঠাকুর পা বাড়িয়ে দিয়েছেন। মহানন্দ অন্য হাত দিয়ে পা টিপছে আর আলাপ শুনছে। আলাপ শুনতে শুনতে এত মুগ্ধ হয়ে গেছে যে, দু'হাত দিয়েই টিপতে শুরু করেছে। প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। কেউ লক্ষ্য করেনি যে, মহানন্দ তার ভাঙা হাত দিয়ে পা টিপছে। হঠাৎ ঠাকুর আলাপ থামিয়ে মহানন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওটা কী, হাতে বেঁধেছিস?" এতক্ষণে সকলের খেয়াল হ'ল যে, ভাঙা হাত দিয়ে মহানন্দ টিপে চলেছে। মহানন্দ নিজেই অবাক হয়ে গেছে। কি উত্তর দেবে ভেবে পাচ্ছে না। ঠাকুর আবার বললেন, "কী একটা কাপড় বেঁধে রেখেছিস! খুলে ফেল।" মহানন্দ দেখলো, হাতে কোন ব্যথা তো নেইই, কিছু যে হয়েছিল, তাও মনে হচ্ছে না। ঠাকুরের নির্দেশমত ব্যান্ডেজটা খুলে ফেললো। দু'দিন পরে ডাক্তারের কাছে হাত দেখালো। ডাক্তার তো শুনে অবাক! পরে এক্সরে করে দেখা গেল, আশ্চর্যভাবে হাত জোড়া লেগে গেছে।

কয়েক মাস কেটে গেছে। মহানন্দ কলকাতা গেছে। এদিকে দীপান্বিতার দিন। ঠাকুরের জন্মোৎসব বিরাট ধুমধাম করে চলেছে। বহু জায়গা থেকে ভক্তেরা এসেছে। ঠাকুর নানারকম উপদেশ নির্দেশ দিয়ে চলেছেন। কথার মাঝখানে হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, "জল, জল।" তাড়াতাড়ি

গ্লাসে করে জল আনা হ'ল। তিনি বললেন, "গ্লাস নয়, বালতি করে জল নিয়ে এস।" তক্ষুনি বালতি করে জল নিয়ে যাওয়া হ'ল। তিনি নিজেই বালতির থেকে জল ছিটাতে লাগলেন। সবাই অবাক হয়ে দেখছে আর ভাবছে, 'কি ব্যাপার?' তারপর হঠাৎ শূন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং এমনভাবে হাত ঘোরালেন যেন, কোন একটা ভারী জিনিস হেঁচকা টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন। সবাই অবাক হয়ে দেখলো যে, তাঁর হাতের দুই একটা লোম পুড়ে গেল। এবার তিনি বললেন, "যাক, বেঁচে গেছে।" সবাই জিজ্ঞেস করলো, "কি হয়েছে? কে বেঁচে গেল?" ঠাকুর বললেন, "এমন কিছু নয়, আবার কিছুও। কলকাতার এক জায়গায় ভীষণ আগুন লেগেছে। উপর থেকে জ্বলন্ত বাঁশগুলো পড়ছে। বহুলোক মারা যাচ্ছে। আমার এক ভক্ত মহানন্দ রায়, ওখানে আটকে পড়েছে। অন্যদের মত সেও বেরোবার পথ পাচ্ছে না। বিপদে পড়ে আমাকে ডাকছে। আগুনটা যখন ওর গায়ে প্রায় লাগার উপক্রম হ'ল, হঠাৎ আমি খবর পেলাম এবং ওকে বাঁচিয়ে দিলাম। তবে আগুনের একটু তাপ তো লেগেছে। এখুনি আশীর্বাদ জানিয়ে ওকে একটা টেলিগ্রাম করে দাও।" এই ব্যাপারটা নিয়ে সমস্ত ঢাকা শহরে ভক্তদের একটা হৈ চৈ পড়ে গেল।

দু'দিন পরে মহানন্দ এসে উপস্থিত। সে কথা বলার আগেই সবাই তাকে বলছে, "খুব জোর বেঁচে গিয়েছ।" সে অবাক হয়ে যায়, "কি করে এরা সব জানলো?" হালসীবাগান কালীপূজা প্যান্ডেলে আগুন লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যে সারা প্যান্ডেলটা দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো। উপরের থেকে জ্বলন্ত বাঁশ, খুঁটি, ক্যানভাস পড়তে থাকে। একটি মাত্র ঢোকার আর বের হবার পথ। কাজেই বহু লোক ভিতরে আটকে পড়ে প্রাণ হারায়। মহানন্দেরও সেই অবস্থা হয়েছিল। বেরোবার কোন উপায় ছিল না, তার উপর আগুনের লেলিহান শিখা তার উপর এগিয়ে আসছে। মহানন্দ নিরুপায় হয়ে ঠাকুরকে স্মরণ করতে শুরু করে। এমন সময় হঠাৎ কে যেন তার ঘাড় ধরে প্যান্ডেলের ভিতর থেকে তুলে রাস্তায় ফেলে দেয়। সে বেঁচে যায়। তা না হলে তার বাঁচবার কোন উপায় ছিল না। পরদিন সকালে সে টেলিগ্রাম পায়, 'আশীর্বাদ – ঠাকুর।'

ঠাকুরের সেদিনকার কার্যকলাপের সঙ্গে মহানন্দের কাহিনীর হুবহু মিল দেখে ভক্তেরা ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলো, "কি করে এতদূর থেকে করলে?" মহানন্দ এসে ঠাকুরের পা জড়িয়ে

কাঁদতে লাগলো। ঠাকুর তাকে আশ্বাস দিয়ে বসালেন। ঠাকুর বলতে শুরু করলেন, "সবই শক্তির খেলা। নিকটই হোক, আর দূরই হোক – শক্তির কাছে ব্যবধান বেশি মনে হয় না। ডাকের মধ্যে যদি জোর থাকে, আর রিসিভার যদি শক্তিশালী হয়, তবে সাড়া দেবেই। ঠিক মুহূর্তে সেই অনুযায়ী সংবাদ পাঠিয়েই হোক বা অন্য কোন প্রকারেই হোক, যার যেভাবে প্রতিকার করা দরকার, তার প্রতিকার করে যাচ্ছে। হস্ত সঞ্চালনের সাথে সাথে একটা সম্পূর্ণ আকার ধারণ করে ঠিক হস্তেরই মত কার্যকলাপগুলো সেখানে করে যাচ্ছে। ঠান্ডার একটা মাত্রা আছে, যখন জল বরফ হয়ে যায়। সেই শক্তির একটা মাত্রা ক্রমশ: ক্রমশ: সঞ্চালনের সাথে সাথে এগিয়ে যায়। একজন শক্তিশালী ব্যক্তি ঐ জাতীয় শক্তি প্রয়োগ করে যে কোন বস্তুকে টেনে আনতে পারে। আগুনে পড়ার ব্যাপারটা ঠিক ওইরকম।" [শ্রীবীরেন্দ্র বাণী।]

একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করলো, "ওকে তো বাঁচিয়েই দিলে, তবে আবার টেলিগ্রাম পাঠালে কেন?" ঠাকুর বললেন, "বেঁচে গেছে ঠিকই, তবে আসন্ন মৃত্যুর আতঙ্কে ও একেবারে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল, কারণ ওর বাঁচবার কোন পথই ছিল না। তার উপর আবার চোখের সামনে মৃত্যু দেখছে, শুনছে মৃত্যুর অন্তিম আর্তনাদ। আর সেই মুহূর্তে ওকে টিনের ঘেরাও পার করে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হ'ল। সবটা মিলে ওর মনে একটা বিরাট চাপ এবং আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। টেলিগ্রামটা পেয়ে আশ্বস্ত হ'ল। মনটা হাল্কা হয়ে গেল। এও একরকমের স্নায়ুর চিকিৎসা।"

সকলে অবাক হয়ে শুনলো ঠাকুরের কথা। কতদূর চিন্তা করে ঠাকুর কাজ করেন!

বেশ কিছুদিন ধরে নানারকম ঘটনা ঘটছে। ঠাকুর ভক্তদের বলে দিয়েছেন যে, যখন তিনি বিশ্রাম করবেন, কেউ না কেউ ঘরে পাহারা দেবে। ওই সময়ে যেন কেউ এসে তাঁকে বিরক্ত না করে। কেউ যদি হঠাৎ ঢুকেও পড়ে, পাহারারত ব্যক্তি যেন সতর্ক থাকে। ঠাকুরকে যেন ওই অবস্থায় কেউ না ছোঁয়। সেদিন ঠাকুর শুয়ে আছেন। একটি ভক্ত পাশে দাঁড়িয়ে বাতাস করছে। ঠাকুর শোবার আগে ভক্তটিকে বলেছেন, "খুব সতর্ক থাকবি। আমি শুয়ে পড়লে কেউ যেন এসে আমাকে না ছোঁয়।" ভক্তটি বাতাস করে চলেছে। ঠাকুর বিশ্রাম করছেন। বেশ কিছুক্ষণ কেটে

গেছে। ভক্তটি বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে আর একটি ভক্ত ঘরে ঢুকেছে। ঠাকুর বিশ্রাম করছেন দেখে সে এগিয়ে গেল পদসেবা করবে বলে। হঠাৎ দেখে একটি সাপ ফণা তুলে তাকে দংশন করতে উদ্যত। ভয়ে সে চিৎকার করে উঠলো। চিৎকার শুনে ঠাকুর উঠে বসলেন; কি ব্যাপার জানতে চাইলেন। ভূপেন রায়কে সামনে দেখে যে ভক্তটি বাতাস করছিল, তাকে বকলেন। এরকম অন্যমনস্ক হওয়া তার উচিত হয়নি। পরে ঠাকুর বললেন যে, তিনি একজন মহাপুরুষকে ভার দিয়ে গিয়েছিলেন, যাতে কেউ তাঁর দেহ স্পর্শ করতে না পারে। যে বাতাস দিচ্ছিল, সে যখন অন্যমনস্ক হয়ে তার কর্তব্যে ত্রুটি করলো এবং ভূপেন রায় এসে ঠাকুরকে প্রায় ছোঁবার উপক্রম করলো, মহাপুরুষটি কোন উপায় না দেখে সর্পাকৃতি হয়ে তাকে ভয় দেখাতে বাধ্য হয়েছিলেন। ভবিষ্যতে যেন তারা অসতর্ক হয়ে কর্তব্যের ত্রুটি না করে, সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করে দিলেন এবং যখন তিনি বিশ্রাম করেন, তাঁর অনুমতি ছাড়া যেন কেউ তাঁকে স্পর্শ না করে।

আর একদিন রাত্রে ঠাকুর মশারির নীচে বিশ্রাম করছেন। ঘরে দু'জন ভক্ত বসে আছে। সমস্ত দেহ থেকে যেন জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন লক্ষ লক্ষ জোনাকির আলোকে সমস্ত দেহ আলোকিত হয়ে উঠেছে। এই সময়ে এইরকম দৃশ্য স্বাভাবিকভাবেই হ'ত বলে কেউ এই জ্যোতি দেখে বিস্মিত হ'ত না। বরং রাত্রে যারা ঠাকুরের কাছে থাকতো, তাদের সুবিধাই হ'ত। কারণ তারা বুঝতে পারতো, ঠাকুর বসে আছেন, না বিশ্রাম করছেন। হঠাৎ একজনের নজর পড়তে দেখে যে, সেই আলোর বিচ্ছুরণ নেই। হয়তো ক্ষণিকের জন্য তার তন্দ্রা এসেছিল। তাই সে আতঙ্কে শিউরে উঠলো, 'ঠাকুর কি তবে বেরিয়ে গেছেন?' সন্তর্পণে টর্চ জ্বেলে দেখে, জানালা দরজা ঠিকই বন্ধ আছে। কিন্তু মশারির নীচে ঠাকুর নেই। হতবাক হয়ে সে বসে থাকে। কি করবে, বুঝতে পারে না। প্রায় ঘন্টাখানেক কেটে গেল। কোন পরিবর্তন নেই। ঘর অন্ধকার। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সে দেখতে পায়, আলোর বিচ্ছুরণ। ঘরটি আবার আলোকিত হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে আলোটি মশারি ভেদ করে ঢুকছে। একটু পরেই ঠাকুর বললেন, "কিরে, ভয় পেয়েছিলি?" "ভয় তো পাবারই কথা। তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"- ভক্তটি উত্তর দেয়। "একটু কাজে বেরিয়েছিলুম। নে এবার শুয়ে পড়," ঠাকুর বললেন।

ঠাকুরের দেহ থেকে এই যে জ্যোতির বিকিরণ – এটাই সেই ইংরেজ মহিলাকে বিস্মিত করেছিল। ইউরোপের অধিবাসীরা শ্বেতকায়। মহিলাটি ঠাকুরের ফর্সা রং দেখে আশ্চর্য হয়নি, আশ্চর্য হয়েছিল তাঁর গায়ের রং-এর ঔজ্বল্যে। দিনের আলোয় ঠাকুরের সমস্ত শরীর ঝলমল করছে। সাধারণ সাদা জামার ভিতর দিয়ে দেহের জ্যোতি যেন ঠিকরে পড়ছে। মহিলা তার কৌতূহল নিবারণ করতে পারলো না। ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়ে এল। সম্ভ্রান্ত ঘরের এই মেয়েটি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল – কি করে ঠাকুর তাঁর দেহের রং এত উজ্জ্বল রাখেন? ঠাকুর জবাব দিয়েছিলেন যে, রাখতে তাঁকে হয় না, আপনি থেকে যায়।

ঢাকা মেলে কলকাতা যাচ্ছেন। ষ্টীমারের ফার্স্টক্লাস ডেকে মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ। মহিলা এক নামকরা পরিবারের মেয়ে। তার বাবা সরকারের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী। মহিলা নানা প্রশ্ন করে। ঠাকুর ইংরাজি বলতে পারেন না। কিন্তু ভাঙা ভাঙা ইংরাজি দিয়েই বুঝিয়ে দিলেন তাঁর বক্তব্য। স্বাধীন দেশে জন্ম; তাই ঠাকুরের দেশাত্মবোধ দেখে তার খুব ভাল লাগে। ঠাকুরের আশ্চর্য যুক্তির কাছে সে হার মানে এবং স্বীকার করে যে, ইংরাজ শাসন দেশের অনেক অনিষ্টের কারণ। দেশের মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে মনুষ্যত্ববোধ প্রায় ভুলিয়ে দিয়েছে এই শাসন। কারণ, পাশ্চাত্য শিক্ষার জালে আবদ্ধ হয়ে, নিজেদের কৃষ্টি হারিয়ে অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে মানুষ দেশাত্মবোধ হারিয়ে ফেলেছে। এই জন্যই তিনি ইংরাজ শাসন পছন্দ করেন না, যদিও ব্যক্তিগতভাবে ইংরাজদের উপর, তাদের দেশাত্মবোধ ও ন্যায়নিষ্ঠার উপর তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। সেদিন ইংরেজ মহিলাটির সঙ্গে অনেক কথাই হ'ল। মহিলাটি জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি কর।' ঠাকুর উত্তর দেন, 'আমি শিক্ষা দিই। মানুষ গড়ি।' মহিলাটির কৌতূহল হয়, 'কি বিষয়ে শিক্ষা দাও?' ঠাকুর উত্তর দেন, "বিশ্বপ্রকৃতির গণিতই আমি চর্চা করি। আর সেই গণিতের ধারাতে সমাজ গঠন করাই আমার উদ্দেশ্য। সেই ধারাতেই আমি শিক্ষা দিই।" মহিলাটি জানতে চায়, 'কি সেই ধারা?' ঠাকুর বললেন, "যে গণিতের নিয়মে বিশ্বপ্রকৃতি চলছে, যে ন্যায় ও নীতির ধারায় চন্দ্র-সূর্য, তারকা, আকাশ, বাতাস আপন আপন কর্ম করে চলেছে নিঃস্বার্থভাবে, সেই গণিতের ধারাতেই আমি সমাজকে শিক্ষা দিয়ে চলেছি। এখানে কোনও বাদাবাদি, ঝগড়া, মারামারি নেই। আছে শুধু অবিচ্ছিন্ন জীবনের অনন্ত

ফোয়ারা। কোনও সংস্কারের বাঁধন নেই, আছে শুধু মুক্ত চিন্তা, মুক্তির আনন্দ। দেখ, আমি ইংরাজি জানি না। তাই তোমাকে ভাল করে বোঝাতে পারলাম না।" মহিলাটি বলে যে সে কিছুটা বুঝেছে। তবে আরও জানতে চায় এবিষয়ে। জীবনদর্শনের এরকম কথা আগে কোনও দিন শোনেনি। তাই আর একটু ভাল করে বুঝতে চায়। ঠাকুর বললেন, "আমি ইংরাজিই জানি না। তোমাকে বোঝাব কি করে?" মহিলাটি উত্তর দেয়, "তুমি যতটুকু জান, তাই যথেষ্ট। তোমার কথা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। আর একটু তলিয়ে বোঝা দরকার।"

যাবার সময় মহিলাটি বলে গেল, "তুমি যদি কখনও দার্জিলিং-এ যাও, আমাকে খবর দিও। মরশুমে মরশুমে আমি দার্জিলিং-এ থাকি।"

কলকাতায় এসে উঠলেন এক ভক্তের বাড়িতে। সঙ্গে রবি ঘোষ আর ভূপেন রায়। ঠিক করেছেন, কলকাতায় দিন পনেরো থাকবেন। বসে আছেন। হঠাৎ চোখের সামনে দেখছেন, দুটো পায়রা উড়ছে। প্রথমে খেয়াল করেননি অতটা। দু'তিনবার দেখার পর বুঝলেন যে ঢাকার বাড়ির চিলেকোঠার ঘর বন্ধ করে আসা হয়েছে। পায়রা দু'টো সেখানে নিশ্চয়ই আটক হয়ে আছে। তখনই রবি ঘোষকে পাঠালেন ঢাকাতে। পায়রা দু'টো দীর্ঘ পনেরো দিন আটকে থাকলে না খেয়ে মারা যাবে, তাই তাদের ঘর থেকে বের করে দিতে নির্দেশ দিয়ে দিলেন। রবি ঘোষ গিয়ে দেখে ঠিক তাই। পায়রা দু'টো বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ ঠাকুর ভূপেন রায়কে নিয়ে রওনা হলেন কালিম্পং-এর পথে। সেখান থেকে লামা সন্ন্যাসীর সাথে সোজা চলে গেলেন গ্যাংটক পেরিয়ে তিব্বতের কাছাকাছি পাহাড় অঞ্চলে। তিব্বতী ভক্তরা ঠাকুরকে পেয়ে ভীষণ খুশি। তাঁর আগমন বার্তা ছড়িয়ে পড়লো পাহাড়ে পাহাড়ে। দলে দলে মানুষ আসতে শুরু করলো। পাহাড়ে রাস্তার দূরত্ব ওদের কাছে বিশেষ কিছুই মনে হয় না। তাই তিব্বতের সাধনক্ষেত্রগুলো থেকেও অনেক লামা এসে হাজির হ'ল। সবাই ঠাকুরের উপদেশ- নির্দেশ চায়, জানতে চায় কিভাবে পথের সন্ধান পাবে।

ঠাকুর শুরু করেন। আদি বেদের শ্লোক অনর্গল বলে যান; সাথে সাথে সহজ ভাষায় সবাইকে বুঝিয়ে দেন। তন্ময় হয়ে শোনে পাহাড়ের মানুষ। সুরই যে আদি, সুর থেকেই যে সৃষ্টি, সেই সুরের খেলাই যে সর্বত্র এবং তার সাধনাই যে মূল কথা, - সহজভাবে বুঝিয়ে দেন সবাইকে। সেই সহজের সন্ধানে সহজভাবে যেতে হলে, চাই উপযুক্ত পরিবেশ। লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরালায় সাধন করা যায়, তাতে ব্যক্তির উন্নতি হতে পারে, ব্যাপ্তির উন্নতি হয় না। ব্যাপ্তির উন্নতির জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ – সুষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা, বেসুরকে অপসারণ করে সুরকে প্রতিষ্ঠিত করা। পাহাড়ের মানুষ অনেক বিষয়ে মুক্ত। তবুও সংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারেনি, হিংসা-দ্বেষহীন সমাজ গড়ে তুলতে পারেনি, পারেনি সবাইকে আপন করে নিতে। তাই এখানে এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যেখানে সবাই একান্নভুক্ত পরিবারের মত সবার সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িত হয়ে একত্রে বসবাস করবে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি থাকবে একটা মিলনের সুর, স্নেহ-প্রেম-ভালবাসার সুর। সবাই পরিশ্রম করবে। সবার প্রয়োজন মত খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়ের ব্যবস্থা থাকবে যাতে ঐ বিষয়ে কাউকে কোন দুশ্চিন্তা না করতে হয়। বাস্তব জীবন যখন এইরকম সহজ সরল হয়ে যাবে, সবার ভিতরে সমতার সুর জেগে উঠবে, উঁচু-নিচু, ধনী-গরীবের প্রশ্ন জাগবে না, মানুষের স্বাভাবিক স্বচ্ছতা ফিরে আসবে, সংকীর্ণতা দূর হয়ে প্রসারতা আসবে, সুর তখন আপনিই তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে।

"ধ্যান-ধারণা, জপতপ করে নিজের সাধনায় অনেকদূর এগোনো যায় ঠিকই, কিন্তু সংস্কার এসে প্রতিপদে বাধা সৃষ্টি করে। সংস্কারের গণ্ডির মধ্যে আটকে না থেকে মনকে ছেড়ে দিতে হবে অসীমের মহাবিস্তারে। মহাশূন্য থেকেই তখন সাড়া আসবে। আর সেই সাড়ার সাড়ায় মনকে ঊর্দ্ধগামী করে দেবে। তাই যা কিছু কর, যে পথেই যাও, মনকে ছেড়ে দাও মহাশূন্যের ধ্যানে। আর সমাজজীবনকে কর সংস্কারমুক্ত। তবেই পাবে প্রকৃত পথের সন্ধান।...."

সে-যাত্রা ঠাকুর বেশিদিন পাহাড় অঞ্চলে রইলেন না। দিন পনের পরে ফিরে এলেন দার্জিলিং-এ। দার্জিলিং-এ এসে খবর পেলেন, সেই ইংরেজ মহিলা দার্জিলিং-এ এসেছে এবং সে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে চায়। ওর জানবার আগ্রহে ঠাকুর খুশি হলেন। ঠাকুরের অসাধারণত্ব

মহিলার মনে দাগ কেটেছে, যদিও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে তার ধারণা খুবই কম। সে জানতে চায় ধর্ম সম্বন্ধে - দুই ধর্মের মধ্যে কী প্রভেদ, মানুষের আচার আচরণে ধর্ম কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে। ঠাকুর বলতে শুরু করলেন, "দেখ, তোমাদের সম্বন্ধে আমি সব জানি না। তোমাদের বই পড়ার সুযোগও আমার হয়নি। আমি ইংরাজি জানি না, সুতরাং আমার কথা ঠিক বুঝবে কি না, বলতে পারছি না। আমি যতটা শুনেছি, তোমাদের ধর্ম কতকগুলো গল্পের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে, যার পিছনে কোন দর্শন নেই। আর আমাদের ধর্ম একটি বিশেষ দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যদিও পরবর্তীকালে কিছু কিছু গল্পের সৃষ্টি করেছে, তবু গল্পটাই সব নয় এবং গল্পের সঠিকতা দর্শনের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়া যায়। তুমি ব'লছ, 'গড সেভ মী', কিন্তু 'গড' সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণাই নেই। ভগবান সম্বন্ধে আমাদের সঠিক ধারণা না থাকলেও দর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে নিলে সব সময়েই আমরা সমাধানে আসতে পারি। এখানকার মানুষ ধর্মপ্রাণ, তাই তাদের বিষয়বুদ্ধি কম এবং এদিকে বেশি নজর দিতেও চায় না। তারা আসলটি নিয়েই থাকতে চায়। আনুষঙ্গিক আর কিছুর দিকে ঝুঁকতে চায় না। ধর্মে প্রায় সর্বত্রই আজ গলদ ঢুকেছে। তবু আমাদের দর্শন এবং বেদ সঠিক পথে চলতে অনেকটা সাহায্য করে। এদেশের লোক তার দর্শন এবং কৃষ্টি সযত্নে রক্ষা করে রাখতে চায়, আর তোমরা তোমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থে সেটা নষ্ট করে দিতে চাও। তোমরা সাধারণ জিনিসটাকেও সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে এমনভাবে পরিবেশন কর যে, ভাল লাগে। যেমন ধর, তোমাদের মনোরম গির্জা, সুন্দর এক ধরনের পোশাক, অর্গান – সবটাই এত সুন্দরভাবে সেট করা যে মনের উপর একটা পবিত্রতার ভাব এনে দেয়। কিন্তু যখন তুমি বল, 'গড সেভ মী', তোমার কোন ধারণাই নাই, ভগবান আসবেন কি না বা কিছু করবেন কি না। বলতে হয়, তাই বল। কিন্তু সত্যিকারের নির্ভরতা তার মধ্যে আছে কি? তুমিই বল। তোমাদের বাইরের চাকচিক্যে মানুষ ভুলে যায়, অবশ্য নিশ্চয়ই তার মধ্যে ভাল কিছু আছে। কিন্তু তুলনায় তার মূল্য কতটুকু, তুমিই ভেবে দেখ। আর এখানে এদের নির্ভরতা এত বেশি যে, বাইরের দিকে নজর খুবই কম।" ..... আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে অনেক কথাই ঠাকুর সেদিন মহিলাটিকে বলেছিলেন। কথা শুনে মহিলা অভিভূত হয়েছিল, বুঝেছিল যে প্রত্যেকের জীবনেই এই সহজাত আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ একান্ত প্রয়োজনীয়। সব থেকে আশ্চর্য হচ্ছে যে, ঠাকুরের ইংরেজি জানা নেই, অথচ তিনি ওই

ইংরেজ মেয়েটির কাছে আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ও স্বয়ংসম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরলেন। ইংরেজ মহিলাটি আরো বুঝতে পারলো যে, আধ্যাত্মিকতা কোন কল্পনার বস্তু নয়। সম্পূর্ণ বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বিজ্ঞানসম্মত।

প্রায় মাসখানেক বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঠাকুর ঢাকায় ফিরে এসেছেন। লোকের ভিড় ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। সাথে সাথে স্বার্থান্বেষী দলও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ঠাকুরের পথ ও পদ্ধতিতে অনেকেই অসুবিধায় পড়ে যাচ্ছে। ধর্মকে যারা ব্যবসায়ে পরিণত করেছে, তাদের কাছে ঠাকুরের সংস্কারমুক্ত বাণী মোটেই অভিপ্রেত নয়। মানুষ যদি তাঁর কাছে না যেত, তবে তাদের বলবার কিছু ছিল না। কিন্তু দলে দলে মানুষ গিয়ে তাঁর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হচ্ছে, দীক্ষা গ্রহণ করছে, অথচ তারা কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারছে না – এটাই তাদের কাছে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে একদিন একটা ঘটনা তাদের কাজে বেশ সুবিধা করে দিল। দর্শনার্থীরা নীচের ঘরে বসে আছেন, বেশ কিছু নতুন লোকও এসেছে দীক্ষা নিতে। এমন সময় এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। তার হাতে গোটা কতক জ্যান্ত মুরগী এবং কয়েক বোতল মদ। ভক্তেরা তাকে ঢুকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এগুলো নিয়ে এখানে এসেছেন কেন?' ভদ্রলোক প্রত্যয়ের সুরে বলে, 'আমার ঠাকুর এগুলো ভালবাসেন। আমি বহুবছর ধরে এগুলো দিয়ে আসছি।' ভক্তেরা প্রতিবাদ করে, 'সে কি কথা! ঠাকুর এসব স্পর্শই করেন না। আপনি কোন্ ঠাকুরের কথা বলছেন?' ভদ্রলোক জবাব দেন, 'কেন, বালক ঠাকুরের কথা বলছি, উনি তো বিরাট তান্ত্রিক। আপনারা বোধ হয় নতুন, সব কথা জানেন না। আমি বহুদিনের শিষ্য, তাই উনি কি পছন্দ করেন, না করেন, আমি সব জানি।' নতুন যারা দীক্ষা নিতে এসেছিল তারা হতবাক হয়ে শুনছে। মনে তাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এসে ঘিরে ধরেছে। সত্যিই কি বালক ঠাকুর তবে তান্ত্রিক? ভক্তেরা বলে, 'ঠিক আছে, এগুলো এখানেই রাখুন। আগে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে আসুন। পরে না হয় এগুলো নিয়ে যাবেন।' প্রথমে ভদ্রলোক আপত্তি করলো। তারপর ভক্তদের কথায় রাজী হয়ে গেল। ভদ্রলোক উপরের ঘরে গেল। ভক্ত, শিষ্য ও দর্শনার্থীদের অনেকেই সঙ্গে গেল ব্যাপার কী দেখার কৌতূহলে। ভদ্রলোক দূর থেকে ঠাকুরকে দেখেই থমকে দাঁড়ালো। ভক্তেরা বললো, "ঠাকুর, এই ভদ্রলোক

কতকগুলো মুরগী আর কয়েক বোতল 'কারণ' নিয়ে এসেছে। বলছে, বহুদিন থেকে নাকি এইসব তোমাকে দিয়ে আসছে।" ঠাকুর ভদ্রলোককে ডাকলেন, জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি? কোথা থেকে এসেছ?" ভদ্রলোক তখন স্বীকার করলো যে, তার ভুল হয়েছে। তার গুরু হচ্ছেন, চট্টগ্রামের তান্ত্রিক বালক সাধু। চট্টগ্রামে থাকতে সে নিয়মিত তাঁকে মুরগী আর কারণ সরবরাহ করতো। কয়েকবছর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। শুনেছে বালক সাধু নাকি ঢাকা এসেছেন। তাই সে মুরগী আর কারণ নিয়ে এসেছে। বালক সাধুর কথা জিজ্ঞাসা করায় লোকে তাকে এই বাড়ি দেখিয়ে দিয়েছে। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, "কতজনকে তুমি রাস্তায় আসতে আসতে বলেছ যে, মুরগী আর কারণ বালক ঠাকুরের জন্য নিয়ে যাচ্ছ?" সে বলে, "আজ্ঞে, তা অনেককেই বলেছি। তখন তো আর আমি জানতুম না যে, বালক ঠাকুর আর বালক সাধু সম্পূর্ণ আলাদা।" "কতজনকে আন্দাজ বলেছ," ঠাকুর জানতে চান। "তা প্রায় পঞ্চাশজন হবে" লোকটি উত্তর দেয়। "তবেই দেখ, পঞ্চাশজনকে তুমি নিজেই একথা বলেছ। তারা আবার বিভিন্ন লোককে বলবে। এইভাবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে বালক ঠাকুর তান্ত্রিক; তিনি মুরগী খান এবং কারণ পান করেন।" লোকটি স্বীকার করলো যে, তা সত্যি। - "তুমি না জেনে কতটা ক্ষতি করলে বুঝতে পারছো?" লোকটি স্বীকার করলো। ঠাকুর বললেন, "ঠিক আছে, যাও। যতটা পার রাস্তায় যাবার সময় সবাইকে বোলো যে, ইনি সেই বালক সাধু নন।" লোকটি তখন পালাতে পারলে বাঁচে। [ঢাকা আরমানিটোলায় একজন তান্ত্রিক সাধু থাকতেন, তাঁর নাম ছিল বালক সাধু। তিনি চট্টগ্রাম থেকে এসেছেন। তাঁর শিষ্যরা মাঝে মাঝে এসে তাঁর খোঁজ করতো। জন্মসিদ্ধ ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী যখন ঢাকায় এসে বসবাস করতে শুরু করলেন, তাঁর নাম অল্প কয়েকদিনের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং 'বালক ঠাকুর' বললে সবাই ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারীকেই বুঝতো এবং তাঁর বাড়িই দেখিয়ে দিত। তারপর ঘটনাক্রমে চট্টগ্রামের তান্ত্রিক বালক সাধুর আগমনে লোকের মনে একটি বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে লাগলো। যারা জানে না, তারা বালক ঠাকুর আর তান্ত্রিক বালক সাধুকে একই ব্যক্তি মনে করতো। স্বার্থান্বেষীর দল অপপ্রচারের জন্য এই বিভ্রান্তিকর অবস্থার সুযোগ নেয়।

শিশুবয়স থেকেই ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে বসে আছেন; আর তত্ত্বজ্ঞানে ও অলৌকিক শক্তির বিকাশে মানুষকে মুগ্ধ করছেন। তাই তাঁকে সবাই বাচ্চা ঠাকুর, বাচ্চা গোঁসাই বলে ডাকতো। সুতরাং 'বালক ঠাকুর' তাঁর আশ্রমের দেওয়া নাম নয়।]

উজানচর-কৃষ্ণনগর থেকে চলে এলেও ঠাকুর মাঝে মাঝে কৃষ্ণনগরে যান, কারণ তাঁর পিতা তখনও উজানচর কাছারীতে কাজ করেন এবং কৃষ্ণনগরেই থাকেন। এমনি একবার চৈত্রমাসে উজানচর-কৃষ্ণনগরে কয়েকদিনের জন্য গেছেন। ঠাকুর এসেছেন শুনে ভক্ত শিষ্যদের ভিড় হতে লাগলো। আশেপাশের কয়েকটি গ্রামেও তাঁকে যেতে হ'ল ভক্তদের অনুরোধে। ইতিমধ্যে একদিন ঢাকা থেকে দু'জন ভক্ত [হরিবন্ধু রায়, হরিদাস চক্রবর্তী] এসেছে। গ্রাম্য পরিবেশে, বিশেষ করে যেখানে ঠাকুর শিশুবয়স থেকে ছিলেন, যেখানে তাঁর পাঠ্যজীবন কাটিয়েছেন, সেই পরিবেশে তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করতে। কাছারী বাড়ির যে ঘরটি ঠাকুরের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, সেই ঘরে ঠাকুর বসে আছেন, ভক্ত দু'জনকে দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে জপে বসতে বললেন। নির্দেশ দিলেন যে, যদি তারা কোন শব্দ শোনে তো গিয়ে দেখবে, কোথা থেকে শব্দ আসছে। ভক্ত দু'জন চোখ বুজে বসে জপ করছে, কয়েক মিনিটের মধ্যে ছাদের উপর থেকে ধুপধাপ আওয়াজ শুনতে পেল। তাকিয়ে দেখে ঠাকুর নেই । অথচ দরজা জানালা সবই ভিতর থেকে বন্ধ। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে দেখে, ঠাকুর ছাদের উপরে বসে খিলখিল করে হাসছেন। ওদের ঘরে গিয়ে বসতে বললেন। ঘরে গিয়ে দেখে, ঠাকুর আগে যেমন বসেছিলেন, সেইভাবেই বসে আছেন। সবটাই যেন ঠাকুরের একটা খেলা।

আর একদিন ঠাকুর শুয়ে আছেন। ওই ভক্ত দু'জন তাঁর নির্দেশমত ধ্যানে বসেছে। হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি পড়লে যেরকমটি হয়, সেইভাবে তাদের গায়ে জল পড়তে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য তাদের জামাকাপড় একটুও ভিজলো না। তারা চোখ বুজে ধ্যান করতে লাগল। ['ইস্টবেঙ্গল টাইমস', ঢাকা (১০ই এপ্রিল, ১৯৪৩) পত্রিকায় এই ঘটনাটি প্রকাশিত হয়েছিল] আগের মতই আবার সেই শান্ত পরিবেশ ফিরে এল। কিছুক্ষণ পরেই পাশের জানালা দিয়ে শোনা গেল, কে যেন বলছে, 'নদীর ধারে যাও'। প্রথমবার তারা বিশেষ গ্রাহ্য করেনি। দ্বিতীয়বার আবার সেই নির্দেশ

শুনতে পেল। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে, ঠাকুর ঘরে নেই। তখনই তারা ছুটলো নদীর ধারে। কিন্তু কোথায়? ঠাকুর সেখানেও নেই। আবার ঘরে ফিরে এল। এবার ছাদের উপর ধুপধাপ শব্দ শুনতে পেল। কিন্তু বেরিয়ে কিছুই দেখতে পায় না। নিরাশ হয়ে ঘরে ফিরছে দেখে ঠাকুর ছাদের উপরেই বসে কৌতুকের হাসি হাসছেন।

ঢাকা ফিরে এসেছেন ঠাকুর। অনেকেই আসছেন ঠাকুরের দর্শন অভিলাষে। তার মধ্যে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী বিভিন্ন রকমের মানুষ আছে। সেদিন যদুনাথ রায়ের বাড়িতে ঠাকুর আলাপ করছেন। জিতেন ঘোষ, সুরেশ পাল, 'চাবুক' পত্রিকার সম্পাদক চারু গুহ, 'ইস্ট বেঙ্গল টাইমসে'র এবং 'পঞ্চায়েত' পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি এবং আরও অনেক লোক এসেছেন। সবাই বেশ বিচক্ষণ, নামডাক আছে। দ্বন্দ্ব ও অবিশ্বাস নিয়ে বসে আছেন এঁরা। কিন্তু একটা শুভলক্ষণ এঁদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, এঁরা যুক্তিতে বিশ্বাস করেন। কিছুক্ষণ আলাপ করে ঠাকুর বললেন, "আমি কি আর বলবো! তোমরা লিখতে চাইছ যখন, তখন একটা প্র্যাকটিক্যাল ডিমনস্ট্রেশন (বাস্তব প্রমাণ) দিই।"

সন্ধ্যা তখন সাতটা-সাড়ে সাতটা হবে। ঠাকুর প্রত্যেককে একটা করে টর্চ বাল্ব কপালে ধরতে বললেন এবং আর এক হাত দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে ধরে রাখতে নির্দেশ দিলেন। পত্রিকার সম্পাদক চারু গুহকে বললেন, এক হাত দিয়ে ঠাকুরের বুড়ো আঙ্গুলটি টিপে ধরতে। চারু গুহ ঠাকুরের বুড়ো আঙ্গুলটি টিপতেই পাঁচজনের কপালের পাঁচটি বাল্ব জ্বলে উঠলো। আশ্চর্য ব্যাপার! কি করে জ্বলে উঠছে? সঠিকভাবে প্রমাণ করার জন্য চারু গুহ একবার ঠাকুরের বুড়ো আঙ্গুল টিপছেন আবার ছেড়ে দিচ্ছেন। ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাল্ব নিভে যাচ্ছে; আবার টিপলেই জ্বলে উঠছে। বারবার এই রকম পরীক্ষা করে ওঁরা নিঃসন্দেহ হলেন।

ঠাকুর তখন বললেন, "জেনারেটর থাকলে আলো জ্বালাবার কোন অসুবিধা নেই। যেই জেনারেটরের সুইচ টিপছো, তোমাদের মধ্য দিয়ে কারেন্ট পাস করে বাল্বগুলো জ্বলছে। আবার যেই বুড়ো আঙ্গুল ছেড়ে দিচ্ছ, লাইন কেটে যাচ্ছে। কারেন্ট পাস করছে না। আলো নিভে যাচ্ছে।" এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর তাঁরা অবিশ্বাস করতে পারেন না। তাঁদের স্বীকার করতেই হয় যে এ অলৌকিক

শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। [এই ঘটনাটি ঢাকার 'পঞ্চায়েত', 'চাবুক', 'ইস্টবেঙ্গল টাইমস' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।]

দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে যদিও বাল্যজীবন কাটিয়ে এসেছেন, পয়সার অভাবে ভাল করে পড়াশুনা করতে পারেন নি, এমন কি শেষপর্যন্ত তাঁকে পড়াশুনা ছেড়ে দিতে হ'ল, তবুও ঠাকুর বহু পরিবারকে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহায্য করে যান। যদি নিজের কথাই তিনি শুধু চিন্তা করতেন, তবে তাঁর পড়াশুনার খরচ চালানোর মোটেই অসুবিধা হ'ত বলে মনে হয় না। কিন্তু ঠাকুরের চিন্তা শুধু নিজের জন্য নয়। তাঁর পরিবারবর্গ ও দীন-দুঃখী অজস্র ভক্তশিষ্যের প্রতি কর্তব্যজ্ঞান সম্বন্ধে সর্বদাই তিনি সচেতন। বাল্যবয়স থেকেই তাই তিনি নানারকম ছোটখাট কাজ করে কর্মের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করতে ভালবাসতেন। সেই উপার্জিত অর্থ দিয়ে যেমন সংসার চালাতে পিতাকে সাহায্য করতেন, তেমনি দীন-দুঃখী দুঃস্থদেরও সাহায্য করতেন। শিষ্যদের কাছে তাঁর কোন চাহিদা নেই, কারও দান তিনি গ্রহণ করেন না। তবু মানুষ সংস্কারবশতঃ অনেকসময় প্রণামী দিয়ে যায়, সেই অর্থ দিয়ে তিনি দুঃস্থ ভক্তশিষ্যদের সাহায্য করেন। এইরকম বহু পরিবার, যারা অভাবের তাড়নায় ছন্নছাড়া হয়ে যেত, ঠাকুরের কৃপায় সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে সমর্থ হয়েছে। বালক ঠাকুরের আশীর্বাদ, সাহায্য-সহযোগিতা না পেলে হাজার হাজার পরিবার সংসার চালাতে অক্ষম হয়ে ভেসে যেত।

সচ্ছলতার অভাবই তাঁর পড়াশুনা না করবার একমাত্র কারণ নয়। লক্ষ লক্ষ ভক্ত-অনুরাগী যাঁর মুখ চেয়ে বসে থাকে, অন্তরের অর্ঘ দেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, বাস্তবের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করতে না পেরে সমস্যার সমাধান খুঁজতে পরমপিতার কাছে ছুটে আসে, তাঁর প্রচলিত ধারায় শিক্ষালাভ করবার অবসর কোথায়? যাই হোক, ঢাকায় এসে তিনি একটি রেডিওর দোকান দিলেন এবং ছোটখাট দু'একটি ব্যবসায়ের মাধ্যমে কিছু নিয়মিত উপার্জনের ব্যবস্থা করলেন, যাতে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে তাঁকে কারও কাছে দান গ্রহণ করতে না হয়। দুই তিন বছরের মধ্যে ঢাকায় স্বামীবাগে একটি ছোট বাড়ি কিনলেন। ঢাকা শহরের এই অঞ্চলের পরিবেশটি অপেক্ষাকৃত শান্ত। ছোট পাকা বাড়ি - ক্ষুদ্র পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট। ভিতরেই কুয়া আছে, সুতরাং

জলের অভাব নেই। রাস্তার উপরেই বাড়িটি। সামনের ঘরটি টিনের চাল দিয়ে বাড়ানো হ'ল, যাতে বেশি লোক সমাগম হলে তাদের স্থান সংকুলান হয়। রাস্তার ওপারেই বিরাট মাঠ, ধারে ধারে কয়েকটি ফলের গাছ তার শোভা বর্ধন করছে। মাঠের শেষে একটি বড় পুষ্করিণী। সুতরাং জলের জন্য কাউকে ভাবতে হয় না। ভোলা গিরির আশ্রম বেশি দূরে নয়। কাছেই একটি সুন্দর আমবাগান। বিরাট অট্টালিকা না হলেও ঠাকুরের এই বাড়িটি ছিল একটি শান্তির নীড়। ভক্তের ভিড় দিনরাত লেগেই থাকতো। ভক্তদের কাছে ঠাকুরের এই বাড়িটির মূল্য অনেক। কারণ ঠাকুরের একটা নিজস্ব আবাসের কথা প্রায়ই তাদের মনে জাগতো। তাই তাদের মনের আশার বাস্তব রূপায়ণ দেখে সবাই খুশি হ'ল।

ঠাকুর উজানচর-কৃষ্ণনগর থেকে দু'তিন বছর আগে চলে এলেও মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে থাকতেন। কারণ তাঁর পিতা তখনও কৃষ্ণনগরেই বসবাস করছেন। ঢাকায় বাড়ি কেনার পর বেশ কয়েকমাস গেল। ঠাকুর আর কৃষ্ণনগর বড় একটা যান না। ঢাকাতেই ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে তাঁর সময় কাটে, ভক্তশিষ্যের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলে। কিছুদিন পরেই ঠাকুরের পিতা চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে মালপত্র নিয়ে ঢাকায় এলেন। কৃষ্ণনগর অঞ্চলে মানুষের গড়া দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দেখা দিল। ঠাকুর প্রায়ই বলতেন, 'যে দেশে তেলের দাম আর ঘিয়ের দাম এক হয়ে যায়, সে দেশে মড়ক লাগবেই। সেখানে আর থাকা উচিৎ নয়।' কৃষ্ণনগরে ওইরকম অবস্থা আসার মুখেই ঠাকুর কৃষ্ণনগর যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। পিতামাতাকে অভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য মাঝে মাঝে জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিতেন। ওই অঞ্চলের অবস্থা যখন প্রায় আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, পয়সা দিয়েও প্রয়োজনীয় খাদ্যসম্ভার পাওয়া যাচ্ছে না, তখন নিরুপায় সুরেন্দ্রচন্দ্র কৃষ্ণনগর কাছারী ছেড়ে ঢাকার বাড়িতে এসে উঠলেন। সংসারের সমস্ত ভার ঠাকুরের ওপর পড়লো। তাতে বিশেষ অসুবিধা হ'ত না, কিন্তু ঠাকুর তো আর একটা সংসারই চালাচ্ছেন না, বহু পরিবার তাঁর ওপর নির্ভরশীল। অর্থে-সামর্থ্যে তাদের সাহায্য করে চলেছেন। তার মধ্যে বিশেষ করে দু'টি পরিবার তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। একটি হচ্ছে এক স্বর্গত ইঞ্জিনিয়ারের পরিবার। ইঞ্জিনিয়ারটি দশটি ছেলে মেয়ে রেখে বহুদিন মারা গেছে। আছে শুধু সম্বলের মধ্যে একটি বাড়ি। ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেউ নিজের

পায়ে দাঁড়াতে পারেনি। সুতরাং ঠাকুরই তাদের ভরসা। বিধবা মহিলা [শৈলবালা দাস] এতগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে দারুণ দুরবস্থায় পড়েছে। সংসার প্রায় অচল। আর একটি হচ্ছে এক স্কুল শিক্ষকের [দেবেশ রায়] পরিবার, তাদেরও ভীষণ টানাটানি। তার উপর আবার শিক্ষক ভদ্রলোকের পেটের ব্যারাম। ডাক্তার কিছু করতে পারছে না - ব্যথায় ছটফট করে তার দিন কাটে। পরিবারবর্গ ভদ্রলোককে নিয়ে ঢাকায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠলো এবং বালক ঠাকুরের শরণাপন্ন হ'ল। ঠাকুর দুই একজন ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে রোগীকে দেখতে গেলেন। তাঁর পাদস্পর্শে দুই-তিন দিনের মধ্যে ভদ্রলোক সুস্থ হয়ে উঠলো। গলষ্টোন রোগীকে এভাবে আরোগ্য লাভ করতে দেখে সবাই তো অবাক। রোগী ভাল হ'ল, কিন্তু সংসার তো চলে না। সুতরাং ঠাকুরকেই সাহায্য করতে হয়। এইরকম নিঃস্বার্থভাবে ঠাকুর যে কত পরিবারকে সাহায্য করে যাচ্ছেন, তার হিসাব দেওয়া কঠিন। যারা তাঁর কৃপা পেয়ে সমাজে দাঁড়াতে পেরেছে, তাদের তো চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকা উচিত! কিন্তু সবাই কি সেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে? ঘটনাক্রমই বলে দেবে, কে প্রাপ্য বলে নিয়েছে, আর কে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রয়েছে। অবশ্য ঠাকুরের কাছে কোনটারই বিশেষ দাম নেই। দেওয়াতেই তাঁর আনন্দ, মানুষের মঙ্গল করাই তাঁর নীতি, কে কি বললো, না বললো, তার জন্য তিনি অপেক্ষা করেন না।

সাধারণ অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে ঠাকুর অভ্যস্ত। দীর্ঘ এগারো-বারো বছর মাটিতে কাগজে মোড়া ইট মাথায় দিয়ে শুয়ে কাটাতেন, অবশ্য বেশির ভাগ রাতই কাটাতেন ধ্যানে। যখন সবাই ঘুমে অচেতন, তিনি বসে আছেন ধ্যানমগ্ন। সাধারণ বেশভূষা পরেই তাঁকে বিরাট ঐশ্বর্যশালী মনে হ'ত। ঢাকায় সংসারের চাপে একটু বিব্রত হয়ে পড়লেও অল্পদিনের মধ্যেই সব সামলে নিলেন। পিতাকে বললেন, 'উজানচর থেকে চলে এসে ভালই করেছেন।' পিতামাতার প্রতি তাঁর ভক্তিশ্রদ্ধা অতুলনীয়। শুধু কথা বলেই তিনি শেষ করেন না, নিজে কর্তব্য পালন করে, সবাইকে পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশিদের প্রতি কর্তব্যপালনে উদ্বুদ্ধ করেন।

একশ্রেণির মানুষ আছে যাদের কাছে বাইরের আড়ম্বরটাই প্রধান। তাদের স্বভাব, লোক দেখানো কিছু একটা করে মানুষকে চমকে দেওয়া, বাহবা নেওয়া। এমনি এক বড় ব্যবসায়ী [নলিনী

বণিক] ঠাকুরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছে, কিন্তু ঠাকুরকে সম্যক উপলব্ধি মনে হয় করতে পারেনি। অবশ্য সম্যক উপলব্ধি করা সহজ নয়, তবু বাস্তবের মানদণ্ডে বিচার করে খানিকটা বোঝা যায়। ঠাকুরের অভাব মোচন করার জন্য সে ঠাকুরকে একটা চেক দিতে চায়, তিন হাজার টাকার চেক। ঠাকুর অনেক নিষেধ করলেন। কিন্তু সে শুনতে রাজী নয়। ঠাকুর এও বললেন, "দেখ, ব্যাঙ্কে যদি টাকা না থাকে দিস না।" জোর গলায় সে বলে, "না, টাকা আছে। তোমার ভাবনা নেই।" লোক-সমক্ষে নিজেকে জাহির করার প্রবণতা তার খুব বেশি। দুঃস্থ মেয়েদের জন্য একটি কুটীরশিল্প প্রকল্প করেছেন ঠাকুর। তাদের কিছু অর্থের প্রয়োজন মেশিন কিনবার জন্য। ব্যবসায়ী যখন জোর করে চেকটি দিতে চায়, ঠাকুর ওদের হাতে চেকটি দিতে নির্দেশ দিয়ে বললেন, "যদি টাকাটা পাওয়া যায়, তোর টাকার কোনদিন অভাব থাকবে না। আর যদি না পাওয়া যায়, তবে তোর ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে।" চেকটি ভাঙ্গিয়ে মেশিন কেনা হবে ঠিক হ'ল। কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে চেক ফেরৎ এল। ব্যবসায়ীর ওই এ্যাকাউন্টে টাকা নেই। ঠাকুর শেষে বলেছিলেন, টাকাটা তিনি দানস্বরূপ নিচ্ছেন না, হাওলাত স্বরূপ নিচ্ছেন। ধীরে ধীরে টাকাটা শোধ করে দেবেন। চেক যে ফেরৎ যাবে, তা মনে হয় ওই ব্যবসায়ীর জানাই ছিল। কারণ তার দিক থেকে আর কোন উদ্যমই দেখা গেল না। জেনে-শুনেই শুধু উপস্থিত সকলের কাছে নিজের নাম জাহির করার জন্যই সে চেকটি দিয়েছিল মনে হয়। আর ঠাকুরও বুঝতে পেরেছিলেন যে, সে শঠতার আশ্রয় নিচ্ছে। যাই হোক, এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যে তার বিরাট গুদামে আগুন লেগে গিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার কাঠ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এইভাবে প্রকৃতির বিচারে সে শাস্তি পেল।

সেবার ঠাকুরের কলকাতা যাবার জল্পনা-কল্পনা চলছে; ভক্তদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে কে কে ঠাকুরের সঙ্গে যাবে, কাকে কাকে ঠাকুর সঙ্গে নেবেন। ঢাকার এক শিষ্য, যে প্রায় বেশির ভাগ সময়ই ঠাকুরের কাছে কাছে থাকে, সে তখন কলকাতায়। সে কলকাতা থেকে একটা চিঠি লিখেছে - জানতে চেয়েছে, ঠাকুর তখন কোথায়। চিঠিতে লিখেছে যে, গত দুই দিন ধরে ঠাকুর কলকাতায় অনেক ভক্ত শিষ্যের বাড়িতে গিয়ে দর্শন দিয়ে এসেছেন। ঠাকুরের এই আকস্মিক দর্শনে তারা এত অভিভূত হয়ে পড়েছে যে, ঠাকুর কোথায় উঠেছেন, সে খবর নিতেও ভুলে গেছে।

ভক্তটি অনেক খোঁজ করেছে, কিন্তু হদিস পাচ্ছে না, ঠাকুর কোথায় উঠেছেন। ব্যাপারটা তার কাছে রহস্যময় লাগছে, তাই সে জানতে চাইছে, 'ঠাকুর এখন কোথায়?' চিঠি পেয়ে ঢাকার ভক্তরা তো হতবাক! বুঝলো যে সে-যাত্রা আর কারও কলকাতা যাওয়া হবে না। কারণ ঠাকুর চিন্ময়দেহে কলকাতা পর্ব সেরে এসেছেন। ভক্তটি [রবি ঘোষ] যখন পরে ঢাকায় ফিরে গিয়ে, ঠাকুরকে বললো, "কি দেখালে ঠাকুর! কলকাতার কত জায়গায় দর্শন দিয়ে এলে?" ঠাকুর বললেন, "যা দেখেছিস, ঠিকই দেখেছিস। এ নিয়ে কখনও আলোচনা করবি না। অন্য যারা দর্শন পেয়েছে, তাদের মনে দ্বন্দ্ব জাগবে।"

সেদিন দর্শনার্থীর অনেক ভিড়। ঠাকুর নানা প্রসঙ্গে আলাপ করছেন। বেশ রাত হয়ে গেল আলাপ করতে করতে। ভক্তেরা একে একে বিদায় নিল। তখন দু'চার জন ভক্ত বসে আছে। ঠাকুর হঠাৎ বললেন, "দেখ, সেদিন একটি লোক এসেছিল। দেখে মনে হয় বেশ ভাল ঘরের ছেলে। দেখলাম, তার হাত-পা কাঁপছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি কোন জন্তুকে মেরেছিলেন?' লোকটি বললো, "হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। পূজামণ্ডপে কাজ করছি, এমন সময় একটি বাছুর পূজামণ্ডপের ভিতর ঢুকে পড়েছে দেখে আমি একটা চড় মেরেছিলাম বাছুরটিকে। বাছুরটা সেই যে মাটিতে পড়ে গেল, আর উঠলো না। দাপাতে দাপাতে মরে গেল।" যে ভক্তটির[2] [অনিল সেনগুপ্ত] দিকে তাকিয়ে ঠাকুর কাহিনীটি বলেছিলেন, সে জিজ্ঞাসা করলো, "ঠাকুর, লোকটির তারপর কি হ'ল?" ঠাকুর জবাব দিলেন না। বেশ কিছু দিন পর, ভক্তটির সঙ্গে তার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের দেখা। আত্মীয়টির হাত-পা কাঁপছে। ঠাকুর যে কাহিনীটি বলেছিলেন, ভক্তটির মনে পড়ে গেল। সে তার আত্মীয়টিকে জিজ্ঞাসা করলো, "আপনি কি কোন জন্তুকে মেরে ফেলেছেন?" আশ্চর্য হয়ে আত্মীয়টি ওর মুখের দিকে তাকালো, তারপর বললো যে, কি একটা পূজার সময়ে একটি বাছুর পূজামণ্ডপে ঢুকে যায়। সে বাছুরটিকে কষে একটা চড় মারে। বাছুরটি মাটিতে পরে দাপাতে দাপাতে মরে গেল। তারপর থেকেই তার হাত পা কাঁপা শুরু হয়েছে। ভক্তটি ওকে ঠাকুরের শরণাপন্ন হতে বললো। লোকটি ঠাকুরের কাছে গিয়ে সব খুলে বললো। ঠাকুর তাকে একটা ফুল দিলেন; সে ধীরে

ধীরে ভাল হয়ে উঠলো। ভক্তটির মনে হ'ল, হয়তো এই ঘটনা ঘটবে বলেই ঠাকুর আগে থেকেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

ব্রিটিশ রাজত্বের একটা চতুর পরিকল্পনা হচ্ছে, 'ডিভাইড এণ্ড রুল' পলিসি। তারা ভালভাবেই বুঝেছিল যে, ভারতে রাজত্ব চালাতে হলে ভারতবাসীর মধ্যে বিভেদপন্থী চিন্তাধারা ঢুকিয়ে দিতে হবে – যাতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকে এবং তারা একত্রিত হয়ে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে লাগতে না পারে। তাই তারা সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা চরম বিরোধ গড়ে তুললো। অবশ্য সব দোষ ব্রিটিশকে দিলে চলবে না, কারণ তারা না হয় পরস্পরের প্রতি বিবাদ-বিচ্ছেদের সুযোগ নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপণ করেছিল, কিন্তু যদি সত্যিকারের দেশপ্রীতি এবং দেশাত্মবোধ থাকতো, তাহলে ভারতবাসীরা কি বিদেশীর প্ররোচনায় ভুলতো? যাই হোক, সাম্প্রদায়িক প্রীতির অভাব ক্রমে এত চরমে উঠলো যে, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ করে ঢাকায়, দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই থাকতো। ঢাকার প্রায় সব জায়গায়ই গোলমাল শুরু হলেও স্বামীবাগে কিন্তু কিছু হ'ত না। সেবার স্বামীবাগের কাছেই এক আমবাগানে মুসলমানেরা জমায়েত হ'ল এবং একযোগে স্বামীবাগের হিন্দু এলাকা আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার পরিকল্পনা করলো। মহম্মদ আলী আর 'রোজ গার্ডেন' এর হিমু মিঞা মুসলমানদের নেতৃত্ব করছে, শোনা গেল। তারা কিন্তু ঠাকুরের পরম ভক্ত। তাই সকলের বিশ্বাস যে স্বামীবাগ আক্রমণ করলেও ঠাকুরবাড়ির উপর কোন আক্রমণ আসবে না। হিন্দুরা সকলে তাই মহিলা ও শিশুদের ঠাকুরবাড়িতে আশ্রয়ের খোঁজে পাঠালেন। ঠাকুরবাড়িতে প্রায় তিন-চারশো মানুষ আশ্রয় নিয়েছে, তিলধারণের জায়গা নেই। এদিকে পরিস্থিতি দেখে ঠাকুর একাই মাথায় পাগড়ী বেঁধে একটা লাঠি হাতে করে আমবাগানের দিকে রওনা হলেন। আমবাগানে যা দেখলেন, তাতে সহজেই অনুমান করতে পারলেন, কি হতে যাচ্ছে; হাজার হাজার মুসলমান জমায়েত হয়েছে সেখানে এবং অস্ত্রশস্ত্র ধার দিচ্ছে। ঠাকুর গম্ভীর স্বরে ডাকলেন, "মহম্মদ আলি!" সকলের দৃষ্টি পড়লো ঠাকুরের দিকে। মহম্মদ আলি এগিয়ে এল। ঠাকুর বললেন, "এ কি হচ্ছে? ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি করে লাভ? আসল শত্রু যে, তাকে চেন। তার সাথে মোকাবিলা কর। আমি হিন্দুও বুঝি না, মুসলমানও বুঝি

না। সবাই দেশের সন্তান। সবাই এক হয়ে তাই দেশের সেবায় লেগে যাও। নিজেদের মধ্যে হানাহানি, মারামারি করে, শক্তিক্ষয় করে আমরা তো আরও দুর্বল হয়ে পড়ছি।..... সুতরাং তোমরা ক্ষান্ত হও। প্রতিজ্ঞা কর যে, এই রক্তক্ষয়ী বিবাদে তোমরা আর কোনদিন অগ্রসর হবে না।" ঠাকুরের উপস্থিতিতেই অনেক কাজ হয়েছিল। তারপর তাঁর কথায় মুসলমান নেতাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন এল। সে যাত্রা স্বামীবাগ দাঙ্গার হাত থেকে রেহাই পেল। তারা কথা দিয়েছিল যে, স্বামীবাগ তারা কোনদিন আক্রমণ করবে না।

কিন্তু কয়েক মাস পরে দেখা গেল, উগ্র চরমপন্থী মুসলমানদের প্ররোচনায় বিভিন্ন এলাকা থেকে স্বামীবাগ ধ্বংস করবার পরিকল্পনা চলছে। যারা কথা দিয়েছিল যে, স্বামীবাগকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উর্দ্ধে রাখবে, তাদের মধ্যেও কিছু কিছু দল মারমুখী হয়ে এগিয়ে এল। এবার তাদের প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে ঠাকুরবাড়ি; কারণ ঠাকুরবাড়ি শেষ করতে না পারলে স্বামীবাগকে ধ্বংস করা যাবে না। ঠাকুরবাড়ি আক্রমণ করবে শুনে বিভিন্ন এলাকা থেকে যুবকেরা আক্রমণ প্রতিহত করতে এগিয়ে এল। কোন মুসলমান যাতে ঢুকতে না পারে তার জন্য স্বামীবাগে চব্বিশ ঘন্টা পাহারা চলছে। ক্রমশঃ আক্রমণ আসন্ন দেখে ছেলেরা ঠাকুরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলো। ঠাকুর একটি কথাই বললেন, "তোমরা আক্রমণ করতে যেও না। তবে আক্রান্ত হলে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা তো নিতেই হবে। তাতে কোন দোষ নেই।" ঠাকুরের নির্দেশ পেয়ে ছেলেদের মধ্যে একটা বিরাট শক্তির সঞ্চার হ'ল। মরিয়া হয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো মুসলমান আক্রমণকারীদের উপর। যে দুর্জয় সাহস নিয়ে সেদিন তারা লড়েছিল, তা অনেকের মনে আজও উদ্দীপনা জাগায়। আক্রমণকারীদের বিশাল জমায়েত মুহূর্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তারা এমন শিক্ষা সেদিন পেয়েছিল যে, আর কোনদিন স্বামীবাগ আক্রমণ করার চেষ্টা করেনি। ঠাকুরের কাছে কথা দিয়ে পরে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তারা সেদিন বুঝেছিল বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম। আর, ছেলেরা যারা আক্রমণ প্রতিরোধ করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তারা নিজেরাও সেদিন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল যে, কি করে তারা সেই বিশাল হাঙ্গামাকারী দলকে ছত্রভঙ্গ করে পিছু হঠতে বাধ্য করেছিল।

কয়েকদিন ধরে শোনা যাচ্ছে, বলধার জমিদার ঠাকুরকে দর্শন করতে আসতে চান। বলধার জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নাম শিক্ষিত সমাজে সবাই জানেন। জ্ঞানী, পণ্ডিত, বহু ভাষাবিদ্ এই জমিদার মহাশয় বহুমুখী প্রতিভার জন্য খ্যাত। তাঁর নিজস্ব বিশাল লাইব্রেরী ও মিউজিয়াম আছে। সেখানে তিনি দেশবিদেশের বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন। নানারকম দেশী-বিদেশী দুষ্প্রাপ্য গাছপালায় ভরা তাঁর বাগানটি ঢাকার একটি দর্শনীয় আকর্ষণ। শিকারী, নাট্যকার, বক্সার ও জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ হিসাবেও তাঁর নাম আছে। বহু জ্ঞানীগুণী চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে যান। নিজের বাড়িতেই একটি রঙ্গমঞ্চ তৈরী করেছেন, নায়ক নায়িকা রেখেছেন। তাদের দিয়ে নিজের লেখা নাটকগুলি মঞ্চস্থ করেন। প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিক এই জমিদার পুরানো দিনের জমিদারদের মত বিলাসব্যসনে দিন কাটান। তার মধ্যেই আবার শাস্ত্রচর্চা করেন। সাধুসজ্জন পেলে নিজের আলয়ে আমন্ত্রণ করে আলাপ আলোচনা করেন। এইভাবে স্বামী নিগমানন্দজীকে এনে কয়েকদিন রাখেন। তাঁর জ্ঞানের গভীরতায় মুগ্ধ হয়ে নিগমানন্দজী নাকি বলেছিলেন, 'আপনাকে আমার নতুন কিছু দেবার নেই। যথাসময়ে আপনার দীক্ষা হবে।' জমিদারবাবুর একমাত্র পুত্রের হঠাৎ অপমৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর দার্শনিক মনোভাব পুত্রশোকও ভুলিয়ে দেয়।

এই বলধার জমিদার এক পরিচিত ভক্তের মাধ্যমে একদিন ঠাকুরের কাছে এলেন। বালক ঠাকুরকে দেখে তাঁর ভাল লাগলো। তিনি বললেন, 'বহু লোকের কাছে আপনার নাম শুনেছি, আপনার অলৌকিক শক্তির বিবরণ পেয়েছি। কিন্তু আপনার দর্শন পাবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আপনি যদি আগামী বুধবার আমার বাড়িতে আসেন তো আমি কৃতার্থ হব।' ঠাকুর যেতে রাজী হলেন।

সেদিন 'বলধা হাউস' এর সুসজ্জিত হলঘরটিতে বহু লোকের সমাগম হয়েছে। কুড়ি পঁচিশটি সুন্দরী অভিনেত্রী ছাড়া খবরের কাগজের কয়েকজন প্রতিনিধি এবং আরও অনেকে সেখানে উপস্থিত। সুগন্ধি ধূপধুনা, সুরভিত ফুলের গন্ধে পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। জমিদার মহাশয় বালক ঠাকুরকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করে এনে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসালেন।

বালক ঠাকুরের প্রতি জমিদার মহাশয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা যথেষ্ট আছে বলে মনে হ'ল। জানবার আগ্রহ আছে ঠিকই, তবু নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করবার ইচ্ছাও তাঁর আছে। দু'টি সেরা সুন্দরী অভিনেত্রী ঠাকুরকে বাতাস করছিল, বোধ হয় নবীন যুবক দেখে ঠাকুরকে পরীক্ষা করবার অভিপ্রায়েই জমিদারবাবু এই ব্যবস্থা করেছেন। কথায় কথায় ঠাকুর জমিদারবাবুকে বুঝিয়ে দিলেন যে, এদের সান্নিধ্যে জমিদারবাবুর মধ্যে যে চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে, তাতে তাঁর পক্ষে মনোযোগ দিয়ে তত্ত্বকথা শোনা সম্ভব হবে কি না সন্দেহ। ধরা পড়ে গিয়ে জমিদারবাবু মেয়ে দু'টিকে অন্য মেয়েদের সঙ্গে গিয়ে বসতে বললেন। আলাপ আলোচনা চলতে লাগল। প্রথমেই ঠাকুর স্বীকার করলেন যে, তাঁর কোন শাস্ত্রগ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় নেই, ইংরাজিও তিনি জানেন না; যে জন্মগত সুর নিয়ে এসেছেন, সেই সুরের কথাই শুধু বলতে পারেন। তবে তিনি যা বলবেন, তাতেই এক নতুন শাস্ত্র তৈরী হয়ে যাবে। বিস্মিত হয়ে জমিদারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, শিশুবয়স থেকে আপনার মধ্যে এই অলৌকিক শক্তির বিকাশ হ'ল কি করে? অন্য কারও তো হয় না!"

উদ্ভিদ জগতের বিভিন্ন গাছপালার জন্য বিভিন্ন মাটি, জল, আবহাওয়া, বিভিন্ন সারের যে প্রয়োজন হয়, সেই উদাহরণ টেনে এনে বালক ঠাকুর বললেন যে, উপযুক্ত ক্ষেত্র ও পরিবেশ পেলে সব বীজেই অঙ্কুর গজাবে এবং তা ফুটে উঠবে। বালক ঠাকুরের ক্ষেত্রে একটা দিকের আপনাআপনি স্ফুরণ হয়ে রয়েছে, যার মাধ্যমে তিনি বুঝেছেন যে, এই বীজ সর্বজীবের ভিতরেই আছে, উপযুক্ততার অভাবে বিকাশ হয় না মাত্র। প্রকৃতির এমন কোন অবস্থার সাথে তাঁর এই গ্ল্যাণ্ডটি এমন ব্যবস্থায় যুক্ত হয়ে রয়েছে, যার ফলে বিশ্ববিরাটের শক্তি প্রকাশে বাধা পায়নি। অনন্ত মহাকাশের সুরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই গ্ল্যাণ্ডটিই ফুটেছে, তাঁর অন্যান্য গ্ল্যাণ্ডগুলি ফুটে ওঠবার সুযোগ পায়নি। তাই শিশুবয়সের চঞ্চলতা, বাস্তবজ্ঞান প্রভৃতি বিকাশলাভ করতে পারেনি। উপযুক্ত পরিবেশে চর্চা করলে প্রত্যেকের মধ্যেই ধীরে ধীরে শক্তির স্ফুরণ হবে। প্রথম প্রথম তিনি আশ্চর্য হতেন কেন লোক তাঁর অলৌকিক শক্তি দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে। সবার মধ্যেই এই বীজ সুপ্ত অবস্থায় আছে, শুধু চর্চা করে ফুটিয়ে তুলতে হবে। কখনও কখনও উপযুক্ত ক্ষেত্রে কারও কারও হঠাৎ স্ফুরণ হয়ে যায়।

ঠাকুরের কথায় জমিদারবাবু অভিভূত হলেন। এবার শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করে, ধ্যান ধারণার জন্য চিত্তসংযম যে আবশ্যক, সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। আরও বললেন যে, নিগমানন্দজীও এই মত পোষণ করেন।

ঠাকুর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, "যে যাই বলুক না কেন, ইন্দ্রিয়কে কেউ কোনদিন সম্পূর্ণ আটকাতে বা বাধা দিতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের কাজ ইন্দ্রিয় করে যাচ্ছে, তার ভিতরেই তোমার কাজ তুমি করে যাও। বিচলিত হবার কি আছে? মনের চঞ্চলতায় কাজ করতে কোন অসুবিধা হবে না। মন সূর্যের আলোর মত চতুর্দিকে ব্যাপ্তমান। সূর্য ব্যাপ্তমান থেকেও ভারী কাঁচের মধ্য দিয়ে গিয়ে আগুন জ্বালাতে পারে। সেইরূপ, মন এত বিরাট যে যেদিকে খুশি বিচরণ করতে পারে, তাতে কিছু এসে যায় না; এই মন নিয়েই কাজ গুছিয়ে নেওয়া যায়। মনের চাঞ্চল্য বা বিক্ষিপ্ততার জন্য অযথা চিন্তা করার প্রয়োজন নেই।"

এই রকম যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা শুনে জমিদারবাবু মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তবু আর একটু পরিষ্কারভাবে বুঝবার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'তবে শাস্ত্রে বলে কেন, কাম ত্যাগ না করলে ভগবদদর্শন হয় না?'

ঠাকুর বললেন, "ওটা ভুল কথা। কাম কখনও ত্যাগ হয় না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একজনও কামকে এড়িয়ে যেতে পারে নি। কাম দিয়ে যদি ভগবানের ভগবত্তা, মহানের মহত্ত্ব, অবতারের অবতারত্ব বিচার করতে হয়, তবে কেউ আর ভগবান হতে পারবে না। কাম বা কামনা থেকেই সৃষ্টি। কামই ইচ্ছাশক্তি। এটাই universal truth. কাম, কামনা বা তৃপ্তি – এর উপর এত গুরুত্ব দিয়েছে কেন? শিব, কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধ – এঁরা সকলেই তো বিবাহ করেছিলেন, সকলেরই তো সন্তান আছে। সুতরাং কামও ছিল। তবুও তো এঁদের ভগবান বলতে বাধেনি! মুনি ঋষিদের বেলাও একই কথা খাটে। প্রত্যেকেরই সহজাত কাম ছিল। তাতে তাঁদের ভগবত্তা বা মহত্ত্ব নষ্ট হয় নি। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি, যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক – এদের ব্যবহারে তো কোন নিষেধ নেই। এরা তো ইচ্ছামত উপভোগ করতে পারে। তবে মুত্রদ্বারের লিঙ্গের বেলায় বাধা কেন? প্রত্যেকটি লিঙ্গেরই এক মাত্রা। প্রত্যেকেই মনের মাধ্যমে আপন আপন কাজ করে চলেছে। তৃপ্তিই কাম এবং প্রত্যেক

ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই তৃপ্তি পাওয়া যায়। শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, স্পর্শ – সবটাই কাম। এই কাম আর মুত্রলিঙ্গের কাম একই মাত্রায় বাঁধা। ভগবদ প্রাপ্তির যে কামনা, তাও কাম। সুতরাং কাম কখনও ত্যাগ করা যায় না। বাইরের বস্তু শুধু উপলক্ষ্য মাত্র। ভিতরের কামনা, ভিতরের তৃপ্তি, বাইরের বস্তুর মাধ্যমে তৃপ্ত হতে চায়। তাই কাম্য বস্তুটির সঙ্গে মনের তৃপ্তি মিশিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে বাইরে। এই ভাবে মনের প্রস্তুতি চলতে থাকে এবং আপন আপন চিন্তার ভিতরেই তৃপ্তি খুঁজে নিতে থাকে। এটাও একটা ধ্যান। নারীই হোক, পুরুষই হোক, সকলেই নিজের নিজের উন্মাদনাকে বাড়িয়ে তুলে নিজের তৃপ্তিতে নিজেই মশগুল হয়ে থাকে। বাইরের বস্তু বাদ দিয়ে, মনে মনে চিন্তা করেও কাম চরিতার্থ করা যায়। ভিতরে যদি ইচ্ছা না জাগে, কাম যদি সুপ্ত অবস্থায় থাকে, তবে কোন বিশ্বসুন্দরী সৌন্দর্য্যের সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেও তার কাম জাগাতে পারবে না। তার কাম থাকবে, কিন্তু ইচ্ছাধীনে থাকবে। সুস্বাদু খাদ্যের বা সুবাসিত ফুলের গন্ধ, প্রিয় জিনিসের স্পর্শ বা নারী বা পুরুষের প্রতি কামভাবের চিন্তাও তার কাম চরিতার্থ করতে পারে। তাতেও ভাললাগার গ্ল্যান্ডের ক্ষরণ হয়ে যায় – এটাও কাম। সুতরাং সব ইন্দ্রিয়গুলিই একমাত্রায়, একসুরে বাঁধা। তাই মুত্রদ্বারের লিঙ্গকে আলাদা করে কাম ত্যাগ করার চিন্তা বৃথা। পার্বত্য অঞ্চলে প্রকৃতির সাথে সুর মিলিয়ে নারী পুরুষ সকলেই উলঙ্গ হয়ে চলছে ফিরছে। মুত্রদ্বারের লিঙ্গের উপর তারা বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করছে না। তাদের কাছে শরীরের প্রতিটি অঙ্গেরই একই মূল্য। আমাদের সভ্যসমাজেই যত গণ্ডগোল। মুত্রদ্বারের লিঙ্গের ওপর বিশেষভাবে মূল্য দিয়ে বসেছে। মনে রাখতে হবে যে, সব ইন্দ্রিয়েরই এক মূল্য। প্রত্যেকটি গণিতের একই নিয়মে বাঁধা। কামনার তৃপ্তিতেই শুধু কাম নয়, যে কোন কামনাই কাম।"

জমিদারবাবু বহু বই পড়েছেন, জ্ঞানও যথেষ্ট আছে। সাধু সন্ন্যাসী পেলেই নিজের বাড়িতে এনে আলাপ আলোচনা করেন। কিন্তু কারও কাছ থেকে তিনি মনের মত উত্তর পাননি। কেউই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। বরং অনেকেই তাঁর মতবাদেরই প্রশংসা করে গেছেন। ঠাকুরের কাছে তিনি এক নতুন দিকের সন্ধান পেয়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তবুও তাঁর মনে প্রশ্ন অনেক।

তাই ঠাকুর বলতে লাগলেন, "শাস্ত্রকাররা এই নিয়ম করেন নি। ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করার ইচ্ছা থেকে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে ধীরে ধীরে এই নিয়ম এসেছে। মনগড়া বাধার গণ্ডীতে বেঁধে না রেখে সব কিছুই যদি প্রকৃতির সুরে সুর মিলিয়ে করা হতো, তবে জীবন কত সহজ সরল হয়ে যেত। সৌন্দর্য সবাইকে আকৃষ্ট করে। এই আকর্ষণ থেকে আসে ঈপ্সিতকে পাবার ইচ্ছা, তার থেকেই জাগে কাম। এটাই সহজাত প্রবৃত্তি। কেউ স্বীকার করুক বা নাই করুক, মনের গতি কখনও রুদ্ধ হয় না। মনের মধ্যে যদি এক্সরে যন্ত্র বসানো যায়, তবে দেখা যাবে যে, প্রতিটি ইন্দ্রিয় মনে মনে তার খোরাক যুগিয়ে তৃপ্তি পাচ্ছে। আর তৃপ্তির সাথে সাথে কামের গ্ল্যাণ্ড থেকে ক্ষরণ হয়ে যাচ্ছে। একটি সুন্দর জিনিস বহু লোককে তৃপ্তি দিতে পারে। প্রকৃতির নিয়ম সর্বজীবের জন্য। তাতে বৈষম্য থাকতে পারে না। পশুপক্ষীই তার জ্বলন্ত উদাহরণ। তারা আপনমনে সমসুরে তাদের সব ইন্দ্রিয়ই ব্যবহার করে চলেছে। আর আমরা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে সমাজের দৃষ্টির অন্তরালে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের পশুধর্ম চরিতার্থ করছি। সংস্কারের বশে সহজ সরল পথ ছেড়ে জীবনযাত্রাকে জটিল করে তুলেছি।"

জমিদারবাবু তখন স্বীকার করলেন যে, এভাবে তিনি কখনও চিন্তা করেননি। আধ্যাত্মিক উন্নতির এক নতুন দরজা তাঁর চোখের সামনে খুলে গেল আজ। তিনি উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

বালক ঠাকুর জমিদারবাবুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "কাজ শুরু করে দাও। যখন ধ্যানে ডুবে যাবে, দেখবে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই তোমার সহায়তা করছে। শুরুতে মন বিক্ষিপ্ত হলে চিন্তার কোন কারণ নেই – এটাই স্বাভাবিক নিয়ম।"

জমিদারবাবু বিনীতভাবে বললেন যে, তিনি শুনেছেন ঠাকুর দেখাবার উদ্দেশ্যে বিভূতি দেখান না। তবুও তাঁর বাসনা কিছু অলৌকিক বিভূতি দেখবার। ঠাকুরের আলাপে জমিদার মুগ্ধ হয়েছিলেন ঠিকই, তবু তার মধ্যে যুবক ঠাকুর সম্বন্ধে একটা সন্দেহ উঁকিঝুঁকি মারছিল। সেটা বুঝতে পেরেই ঠাকুর হঠাৎ উলঙ্গ হয়ে সবাইকে তার লিঙ্গ পরীক্ষা করতে বললেন। বহুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করেও কোন সাড়া না পেয়ে, জমিদারবাবু সবিস্ময়ে বলতে বাধ্য হলেন, "আপনি তো খোজা ন'ন। আপনার দাড়িগোঁফ তো আছে, তবে কি ক'রে এরকম হ'ল? আপনার কি কাম নেই?" ঠাকুর

জবাব দিলেন, 'আমার সব লিঙ্গই একরকম। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক – যেটাই স্পর্শ কর না কেন, একই অবস্থা। খাওয়ার দিক থেকে, দেখার দিক থেকে, আমোদ-আহ্লাদের দিক থেকে, কোনদিক থেকেই আমার কোন উচ্ছাস নেই। আমার কাম ঠিকই আছে। সে তার সাড়া নিচ্ছে, আমি তার সাড়া দিচ্ছি না।"[ভক্তদের প্রশ্নের উত্তরে পরে ঠাকুর বলেন, 'ওর মনের কথা বলে দেওয়াতে জমিদার চমকে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, পার্থিব কাম আমাকে স্পর্শ করে না। তাই অনাবৃত হয়ে ওর মনের সন্দেহ কাটিয়ে দিলাম। আমার কাছে কাপড় পরা, না-পরা একই কথা।']

শরণাগত হয়ে এই প্রথম জমিদারবাবু বালক ঠাকুরকে প্রণাম করলেন।

একটু থেমে, বালক ঠাকুর আবার বলতে শুরু করলেন, "সন্তানের মঙ্গলকামনা নিয়ে মাতাপিতা কাজ করেন। রোগীর চিকিৎসায় ডাক্তারেরও একই রকমের চিন্তা - মাতাপিতা যেমন সন্তানের যাতে ভাল হয় সেই বুঝে কাজ করেন, ডাক্তারও তেমনি রোগীকে যাতে ভাল করা যায়, সেই চিন্তাতেই কাজ করেন। প্রয়োজনবোধে তাঁর কর্মের ধারার যতটা বলা দরকার জানিয়ে দেন। তা সত্ত্বেও প্রতিপদে যদি তাঁদের কৈফিয়ৎ দিয়ে কাজ করতে হয়, তবে স্বভাবজাত অন্তরের সম্পর্কের মধ্যে বাধার সৃষ্টি হয় এবং মন ভেঙে যায়। গুরু শিষ্যকে দীক্ষা দিয়ে অন্তরের গভীরতার সঙ্গে যুক্ত করে নেন এবং মাতাপিতা বা ডাক্তারের থেকে বেশি দায়িত্ব বহন করেন। সন্তানদের বহু সমস্যার মধ্যে গুরু যেটাকে ভাল হবে মনে করেন, সেটাই করেন। সকলকে তিনি অতি আপন মনে করেন, তাই তাকে জানিয়ে কিছু করার প্রয়োজন বোধ করেন না। কোন কারণে যদি সন্তান গুরুর উপর নির্ভরশীল না হয় এবং তাঁকে ভুল বোঝে, তবে তাঁর স্বাভাবিক সহজ গতির পথে বাধার সৃষ্টি হয়। গুরুকে যদি তাঁর কাজের জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হয় বা নিজেকে অনাবৃত করে শিষ্যের সন্দেহ মোচন করতে হয়, তবে তিনি সহজ সরল পথে আর এগোতে পারেন না। কারণ সন্তান তাঁর অন্তরের গভীর সম্পর্কের মূল্য দিতে পারে নি। পরে তিনি ক্ষমা করে দিলেও, ঘটনাটা তাঁকে সব সময়েই ব্যাথা দেয়। পুরাণে আছে শুনি, বিশ্বকর্মা জগন্নাথের মূর্তি যখন গড়ছিলেন, শর্ত লঙ্ঘন করে একজন উঁকি দিয়ে দেখেছিল। তাই গড়ার কাজে বাধা পড়লো। জগন্নাথের মূর্তি ঠুঁঠোই রয়ে গেল।

গুরুর কাজেও একই কথা খাটে। ভুল বুঝাবুঝির জন্য গড়ার কাজে বাধা পড়লে ঠুঁঠো জগন্নাথের মত শিষ্যকেও অনেক সময় ঠুঁঠো হয়ে বেরিয়ে যেতে হয়।".....

"প্রকৃত গুরু আসেন ইতিহাসের ঐতিহ্যের ধারায় - জন্ম থেকেই নিয়ে আসেন দেবত্বের চরম বিকাশ।..... জন্মসিদ্ধ গুরুর ভিতরের ও বাইরের কাম-ইন্দ্রিয় থাকে সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে। অন্তরের অন্তঃস্থলের গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে তিনি মহাকাশের অসীমতায় বিচরণ করেন। তাই তিনি সীমাহীন মহাকাশের সঙ্গে চিরন্তন লীলায় যুক্ত থেকে বিভিন্ন কাজে লিপ্ত থেকেও, বাস্তবের যে কোন কাজ করতে পারেন। তাঁর পক্ষে এই দুরূহ কাজ করা সম্ভব।"

জমিদার বাবুকে লক্ষ্য করে বললেন, "কোথায় লাগে জান? মানুষ আমার অন্তরের গভীর প্রেম-ভালবাসাকেও ভুল বোঝে, সাধারণের পর্যায়ে ফেলে আমাকে বিচার করে। আমার তত্ত্ব বিশ্লেষণেই তো বিচক্ষণ ব্যক্তির বোঝা উচিত, আমি কি!" জমিদারবাবু নম্র হয়ে ক্ষমা চাইলেন।.....

জমিদার বাবুর দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ কাটেনি দেখে বিশ্লেষণ করে ঠাকুর বুঝিয়ে দিলেন – জীবজগতের সহজাত যে কাম, মাতা-পুত্রের সম্পর্কের ভিতরে তা সংযত। স্নেহ-মমতা, আদর, চুম্বনের যে কামনা, সে কামনা ঠিকই আছে। বালক ঠাকুরের কামভাবও সেই কামনারই ধারায়। জন্মাবধি তিনি অনন্ত বিশ্বের গভীর চিন্তাধারার মধ্যে মগ্ন হয়ে আছেন। প্রকৃতির ধারার মধ্যে তিনি গভীরভাবে ডুবে আছেন বলে পার্থিব কামের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ নেই।.....

বালক ঠাকুরের বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে যে, তিনি সদাসর্বদা সূক্ষ্মাকারে অনন্ত মহাকাশে বিচরণ করছেন – এটাই তাঁর প্রকৃত পরিচয়। ওই মহাকাশে বিচরণের অবস্থাতেই মানুষের প্রয়োজনে নীচে নেমে এসে তিনি কথাবার্তা বলেন, আচার ব্যবহার করেন, এখানে তাঁর গতিবিধি শুধু মানুষের প্রয়োজনের খাতিরে। মহাকাশে বিচরণের অবস্থায়, এই দেহেতেও সেই সমতা রক্ষা করে, প্রয়োজনবোধে তিনি সব কাজ করে যাচ্ছেন। তথাকথিত উঁচু-নিচুর কথা আমাদের ব্যক্তিগত ধারণার প্রকাশমাত্র। মহাকাশের উঁচুও নেই, নিচুও নেই। সুতরাং নীচে নামার কথা খাটে না। সর্বাবস্থায় একই কথা। বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত ইচ্ছার সঙ্গে প্রতিনিয়ত মহাসঙ্গমে রত থেকে, তাঁর

কামেচ্ছা - চিদানন্দ, মহানন্দের তৃপ্তিতে মিশে আছে। তাই এখানকার কাম তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারে না। তাঁর মধ্যে যে কামের ইচ্ছা, সেটা কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে সুন্দরভাবে তিনি বুঝিয়ে দেন। যেমন, ধরা যাক, মুক্ত আকাশে বিচরণে রত একটি পাখি বা জল, বাতাস। মুক্ত পাখি – সে অনন্ত মহাকাশের অসীমতায় আপন মনে অফুরন্ত আনন্দে বিচরণ করে বেড়ায়। সমূহ প্রয়োজনে যদিও বা সে মাটির বুকে মাঝে মাঝে হেঁটে বেড়ায়, তার মন কিন্তু সবসময় মহাকাশের অসীমতায় ভরপুর হয়ে থাকে। জলের গতি নিম্নমুখী, তা হলেও সে ঊর্দ্ধমুখী। নিম্নপথে সে চলে ঠিকই, কিন্তু কখনও নীচতার দিকে যায় না। সে ঊর্ধে বিরাজমান। সূক্ষ্মাকারে সে আকাশ, বাতাস, মেঘের সঙ্গে সদাসর্বদা ঊর্দ্ধমুখী হয়ে চলেছে। সেই ঊর্দ্ধ থেকেই জগতের রক্ষাকল্পে সে নেমে আসে, ধরা দেয়। জলের গতি তাই বিশ্বপ্রকৃতির সুরের সাথে সুর মিলিয়ে সদাসর্বদাই ঊর্দ্ধমুখী। অনন্ত বিশ্বের ইচ্ছা বা কামনার কথা বলতে গিয়ে বালক ঠাকুর বলেন যে, ইচ্ছা সূক্ষ্মাকারে 'আছে'র মধ্যে 'আছি' হয়ে আছে। আবার 'আছি' অবস্থা থেকেই সবসময়ে মহাকাশের 'নাই' অবস্থার সাথে 'নাই' হয়ে মিশে আছে। বাস্তবে তার সমস্ত গতির মধ্যে, গতির পথে মনে 'আছে' কিন্তু 'নাই' অবস্থায় 'আছি' হয়ে আছে। তার দৃষ্টিতে কোন বৈষম্য নেই। এই চিন্তা সর্ববস্তুতে, সর্বচিন্তায় ন্যস্ত। জল বাতাসে থাকে। বাতাসের মাধ্যমেই সে নীচে নেমে এসে সবাইকে ধরা দেয়। কিন্তু তাকে কেউ ধরতে পারে না। তবুও সে ধরা দিয়ে যাচ্ছে। এটাই sex বা কাম। সাধারণভাবে যে ধরা দেওয়া, এ ধরা সে ধরা নয়। সাধারণভাবে সে বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে যে, সে আছে - কিন্তু অন্যের 'আছি'র সাথে এই আছি এক নয়। একে বুঝেও বোঝানো যায় না, ধরেও ধরা যায় না।

বালক ঠাকুর বলতে লাগলেন, "আমি মহাকাশে বিরাজমান মন নিয়ে সর্ববস্তুতে ধরা দিয়েও ধরা দিই না। আমি আকাশে বাতাসে মিশে থাকি। কেউ যদি বলে, 'আমি সূর্যকে পেয়েছি', সেটা ঠিক নয়। সূর্যের আলো এসে পড়েছে এখানে, সেই আলো পেতে পারে; কিন্তু সূর্য অনেক দূরে। সূর্যের আলো পেলেও সূর্যকে ধরা যাচ্ছে না।"

"জল বাতাসে আছে। সেই জলই সাগরে ঢেউ খেলছে। আবার মহাকাশেও সেই জলের অস্তিত্ব রয়েছে। ধরতে পেরেছি বলে মনে হলেও কোন অবস্থাতেই তাকে ধরা যায় না। সেই রকম

মন সেই সূক্ষ্ম চিন্তায় মহাকাশের সাথে মিশিয়ে রাখলে, সেটা যদি ফুটে ওঠে, তবে সেই চিন্তাতেই চলতে থাকে। অন্য কোন চিন্তায় চলা তখন সম্ভব নয়। এই কথা ভাষায় ঠিক ব্যক্ত করা যায় না।"

ঠাকুর এবার জমিদারবাবুকে একটা টর্চের বাল্ব নিজের কপালে ধরতে বললেন এবং আরেক হাত দিয়ে ঠাকুরের পায়ের বুড়ো আঙ্গুল স্পর্শ করতে বললেন। ঠাকুরের পায়ের বুড়ো আঙ্গুল স্পর্শ করার সাথে সাথে বাল্বটি জ্বলে উঠলো। সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। বালক ঠাকুর বললেন, "এই শক্তি নষ্ট হওয়ার জিনিস নয়। এটা চিরকাল, চিরযুগ থাকে।"

জমিদারবাবু এবার আত্মসমর্পণ করে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। দক্ষিণাস্বরূপ এক হাজার টাকা দামের একটি বিদেশী সেন্ট আর কিছু টাকা দিতে চাইলে, বালক ঠাকুর জানালেন যে, দীক্ষার বিনিময়ে তিনি কখনও অর্থ গ্রহণ করেন না। তিনি শুধু চান মন-দক্ষিণা। বালক ঠাকুরের শুভ পদার্পণের দিনটিতেই জমিদারবাবুর বাগানে একটি অপূর্ব সুগন্ধি ফুল ফুটেছিল। শোনা যায়, এই ফুল নাকি শত বছরে একবার ফোটে। বালক ঠাকুর ফুলটির নাম রাখলেন পারিজাত। [শ্রী বীরেন্দ্র বাণী

'পঞ্চায়েত', ঢাকা - ১৭ই বৈশাখ, শনিবার ১৯৫০' ইস্টবেঙ্গল টাইমস', ঢাকা - ১০, ১৭, ২৪, ৩১শে মে, ১৯৪৩]

কত যে সমস্যার সমাধান করতে হয় বালক ঠাকুরকে, বলে শেষ করা যায় না। প্রতিদিনই সমস্যার পর সমস্যা নিয়ে লোক আসছে সমাধানের আশায় আর ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা দিয়ে চলেছেন। অদ্ভুতভাবে প্রতিটি ব্যবস্থাই করছেন। এমনই একদিন একটি পরিবার এসেছে – তাদের বিরাট সমস্যা। বাড়িতে বৃদ্ধা মা। বাড়ির একটি ছেলের বিবাহ দেওয়ার জন্য মা ভীষণ ব্যস্ত। মেয়ে দেখা হয়েছে। পাকা দেখা, আশীর্বাদ করাও হয়ে গেছে। বিয়ের দিনও ঠিক। ইতিমধ্যে ছেলে কাজের খাতিরে গেছে সুন্দরবন অঞ্চলে। ওখানে নদী পার হবার সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটে। ছেলে মাতলা নদীর জলে পড়ে যায়। মাতলা নদীতে কুমীরের অভাব নেই। সুতরাং কুমীরের গ্রাসে সে প্রাণ হারায়। টেলিগ্রাম এসেছে বাড়িতে যে, ছেলেকে কুমীরে খেয়েছে। বৃদ্ধা মাকে এই খবরটি

জানানো হয়নি। তাঁর যে রকম শরীরের অবস্থা, এই দুঃসংবাদ শুনেই তিনি হার্টফেল করবেন। বিয়ের আর কয়েকদিন মাত্র বাকী। সব আয়োজন করা হয়ে গেছে। এই অবস্থায় কী করে তারা মেয়ের বাড়িতে এই দুঃসংবাদ পৌঁছে দেবে? তাই ঠাকুরের কাছে এসেছে নিরুপায় হয়ে, একটা কিছু ব্যবস্থা করার জন্য। ঠাকুর সব কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "ঠিক আছে, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বৃদ্ধাকে জানাবার ভার আমি নিচ্ছি।"

সেদিন রাত্রেই বৃদ্ধা স্বপ্ন দেখছে, তার বড় ছেলে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে বলছে, 'মা, আমাকে কুমীরে খেয়েছে। তোমার সাথে তো আর দেখা হবে না, তাই দেখা করে যাচ্ছি। মেয়েটি তো কোন দোষ করেনি। আমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ওর বিয়েটা দিয়ে দিও।' স্বপ্ন দেখে পরদিনই বৃদ্ধা ঠাকুরের কাছে এসে কেঁদে পড়লো, 'ঠাকুর, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। ছেলেকে আমার কুমীরে খেয়েছে।'.....ঠাকুর বৃদ্ধার সব কথা শুনে বললেন, "ছেলে যখন নিজেই এসে তোমাকে বলেছে, এক কাজ কর - তোমার ছোট ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দাও। আর বড় ছেলের জন্য তিনদিন পরে একটা শ্রাদ্ধশান্তি করে ফেল।" স্বপ্ন দেখে বৃদ্ধার শোকের অনেকটা উপশম হয়েছিল। 'সেইদিনই এসেছে' বলে টেলিগ্রামের খবরটি দেওয়া হ'ল তাকে। মেয়ের বাড়িতেও দুর্ঘটনার খবরটি জানিয়ে বৃদ্ধার ছোট ছেলের সঙ্গে নির্দিষ্ট দিনেই বিবাহের বন্দোবস্ত করা হ'ল। এইভাবে সবদিক রক্ষা হ'ল। একটা সুষ্ঠু সমাধান হয়ে গেল।

ভক্তেরা পরে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলো, 'ঠাকুর, এত সহজে এই বিরাট সমস্যার সমাধান করলে কি করে?' ঠাকুর বললেন, "বৃদ্ধাকে খবরটি দেওয়াই ছিল সবচেয়ে কঠিন কাজ। হঠাৎ তাকে ছেলের মৃত্যুর খবর দিলে হয়তো হার্টফেল করতো। ওকে ধাতস্থ করবার জন্য স্বপ্নের মাধ্যমে খবরটি জানাবার ব্যবস্থা করলাম। ছেলে মারা গিয়েছে - বৃদ্ধা শোকে অভিভূত, সন্দেহ নেই। তবে স্বপ্নে ছেলেকে দেখে এবং তার মুখে দুর্ঘটনার কথা শুনে বৃদ্ধার মনঃকষ্ট অনেকটা লাঘব হয়ে গেল। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ের প্রস্তাব এমনিতে বৃদ্ধা কিছুতেই মানতো না। কারণ তার ধারণা হ'ত যে, মেয়েটি অপয়া, তাই তার ছেলে মারা গেল। এখন স্বপ্নে ছেলের মুখ থেকে প্রস্তাবটি

শুনে বৃদ্ধার আর কোন আপত্তি রইল না। যেটুকু ছিল, তা আমার কথাতেই ঠিক হয়ে গেল। দেখলে তো, কি পরিশ্রম আমাকে করতে হয়! মানুষের মন বুঝে বুঝে কাজ করতে হয়।"

ঢাকাতে একদিন কয়েকজন ভক্ত নিয়ে ঘোড়ার গাড়ী করে এক জায়গায় যাচ্ছেন। তখন বিশ্বযুদ্ধ চলছে। জার্মানী ও জাপানের দুর্জয় অভিযানে পৃথিবীর সারাদেশ কম্পিত, মিত্রশক্তি বিপর্যস্ত। ভক্তেরা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলো, 'এই যুদ্ধে তো অনেক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, অনেক দেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বহুলোক প্রাণ হারাচ্ছে। এই যুদ্ধ আর কতদিন চলবে, ঠাকুর? তারপর কি আবার শান্তি ফিরে আসবে?'

ঠাকুর বললেন, "কিছু ক্ষয়ক্ষতি তো হবেই। তবে সবাই সামলে নেবে। এই একটা যুদ্ধ দেখছিস এখন, আরেকটা যুদ্ধ দেখবি। সেটাই হবে শেষযুদ্ধ। তারপর পৃথিবীতে শান্তি আসবে।"

'কবে সেই শান্তি আসবে ঠাকুর? আমরা দেখে যেতে পারবো তো?' –ভক্তেরা প্রশ্ন করে।

ঠাকুর বলেন, "এসব কথা আমায় জিজ্ঞাসা করবে না। তবে আমি যতদিন এই পৃথিবীতে আছি, আমি নিজেও শান্তিতে থাকবো না, আর কেউই শান্তিতে থাকতে পারবে না। এ বিশ্বে কলহ-বিবাদ, গৃহযুদ্ধ লেগেই থাকবে। মারামারি, কাটাকাটি হতে হতে শেষে আসবে শান্তি।" ঘোড়ার গাড়ী তখন কোর্টের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। আসামীর কাঠগড়ায় একটি লামা সন্ন্যাসীকে দেখে এক ভক্ত বলে উঠলো, 'যত সব চোর-জোচ্চোর সাধুর বেশে ঘুরে বেড়ায়!' ঠাকুর বললেন, "না রে, একদিন আমাকেও এইভাবে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।" ভক্তটি বললো, 'কি বলছো ঠাকুর? তোমাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে?'.....

এক ভক্ত এসে ঠাকুরকে একদিন জিজ্ঞাসা করলো, 'আমাদের যে সম্পত্তিটা পদ্মায় ভেঙে নিয়েছে, সেটার জন্য জলকর দেব কি?' ঠাকুর বললেন, 'জলকরটা দিয়ে যা।' প্রত্যেক বছরই ভক্তটি এসে জিজ্ঞাসা করে, আর ঠাকুর জলকর দিয়ে যেতে বলেন। এইভাবে প্রায় ছয়-সাত বছর কেটে গেছে। ভক্তটি একদিন এসে বললো, 'ঠাকুর, চরটা জাগবার তো কোন চিহ্নই দেখছি না,

অথচ শুধু জলকর দিয়েই চলেছি। এভাবে আর কতদিন চালাবো? টাকাটা শুধু জলেই যাচ্ছে। জলকর দেওয়াটা কি এখন বন্ধ করে দেব?' ঠাকুর আগের মতই আবার বললেন, 'না, জলকরটা দিয়ে দে।' তার পরের বছর চরটা জেগে উঠলো বিরাট আয়তন নিয়ে – দৈর্ঘ্যে প্রস্থে যথাক্রমে প্রায় আড়াই মাইল এবং দেড় মাইল। ভক্তটি ছুটে এসে ঠাকুরকে জানায়, 'ভাগ্যিস, তোমার কথামত জলকরটা দিয়ে গেছি! তাইতো আজ চরটার দখল পাব।' ঠাকুর হেসে বললেন, 'আমাকে কি কম পরিশ্রম করতে হয়েছে, এর জন্য? তুই তো জলকর না দিতে পারলেই বাঁচতিস।'

কিছুদিনের মধ্যেই ভক্তটি চরের জমি বিলিব্যবস্থা করে বহু টাকা উপার্জন করে।

বাইরের কাজে হোক, সংসারে হোক - যে কোন আপদে বিপদে ভক্তেরা ছুটে আসে ঠাকুরের কাছে, তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা, আদেশ-নির্দেশ খোঁজে। ঠাকুরও বিরক্তিহীনভাবে সকলের সমস্যার সমাধান করে দেন। এইরকম এক ভক্ত একদিন এসে ঠাকুরকে ধরলো, 'আমাকে বাঁচাও ঠাকুর!' জানা গেল, সে এক বিলাতী জাহাজ কোম্পানীতে নিয়মিত ডিম সরবরাহ করে বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। জমিজায়গা, বাড়িঘর করেছে; অবস্থা বেশ সচ্ছল। কিন্তু এবার সে লোভের বশবর্তী হয়ে বেশি লাভ করার আশায় 'ফার্স্টক্লাস' ডিমের পরিবর্তে 'সেকেন্ডক্লাস' ডিম সরবরাহ করেছে। কোম্পানীর সাহেব ডিম পরীক্ষা করে তার শঠতা ধরতে পেরেছে। শোনা যাচ্ছে যে, ঠিক হয়েছে তার কাছ থেকে আর ডিম নেওয়া হবে না। তাই ঠাকুরের কাছে সে ছুটে এসেছে। ঠাকুর বললেন, 'কাজটা খুব অন্যায় করেছিস। কেন তুই সেকেন্ডক্লাস ডিম দিতে গেলি?' ভক্তটি বলে, 'আমার ভীষণ ভুল হয়েছে। এখন কি করবো বল? সাহেব একবার কালো খাতায় আমার নাম তুলে দিলে আর কোথাও আমি ভাল কন্ট্রাক্ট পাব না।' ঠাকুর বললেন, "ঠিক আছে। আমি তোকে এবারের মত বাঁচিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমি যা বলবো, তাই করতে হবে।" ভক্তটি বলে, 'হ্যাঁ ঠাকুর, তুমি যা বলবে, তাই করবো।' ঠাকুর তখন বললেন, "এক কাজ কর। তুই যে পরিমাণ ডিম সাপ্লাই দিয়েছিস, সেই পরিমাণ ফার্স্টক্লাস ডিম সঙ্গে নিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা কর। বলবি যে, বাড়িতে তুই আগের সাপ্লাই থেকে কিছু ডিম দেখেছিস যে ডিমগুলো ভাল নয় এবং যে ডিম তুই নিজের বাড়িতে ব্যবহার করতে পারলি না, সেই ডিম সাহেবকে কি করে খাওয়াবি! তাই আবার টাটকা ডিম

নিয়ে এসেছিস। সাহেব যদি ডিম নাও নিতে চায়, ডিমগুলো দিয়ে আসবি, বলবি যে – এগুলোর জন্য পয়সা দিতে হবে না।"

ভক্তটি ঠাকুরের কথামত সাহেবকে টাটকা ডিম সাপ্লাই দিয়ে এল। সাহেব প্রথমে নিতে চায়নি; বলেছে যে, একবার বিল পাশ হয়ে গেছে; সুতরাং আর নেবার উপায় নেই। তারপর যখন সাহেব দেখলো যে, কন্ট্রাক্টরটি টাটকা ডিমগুলির জন্য কোন পয়সা নিতে চাইছে না, তার বিরূপ মনোভাবের পরিবর্তন হ'ল। ভক্তটির কথায় ও কাজে ওর সম্বন্ধে সাহেবের মনে যে অবিশ্বাস এসেছিল, সেটা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল। সাহেব বুঝলো যে লোকটি সৎ - কোন অবস্থায় পড়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে একটা ভুল করে ফেলেছে। সুতরাং ওর বিরুদ্ধে কোন কড়া ব্যবস্থা নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। বিদায় নেবার সময় ভক্তটি বুঝে এল যে, সাহেবের মেজাজ ঠিক হয়ে গেছে। কয়েকদিনের মধ্যে সে ডিম সাপ্লাইয়ের অর্ডার আবার পেয়ে গেল।

ঠাকুর কয়েকদিনের জন্য নারিন্দায় যদুনাথ রায়ের বাড়িতে বিশ্রামের জন্য গেছেন। কিন্তু বিশ্রামের কি উপায় আছে! অল্প সময়ের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল, ঠাকুর নারিন্দায় আছেন। অনেক লোক আসতে শুরু করলো। এর মধ্যে একদিন খবর পেয়ে কয়েকজন ভদ্রলোক একটি উন্মাদিনী স্ত্রীলোককে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির।[1][শ্রীবীরেন্দ্রবাণী] ঠাকুর স্ত্রীলোকটিকে ডাকালেন। দু'তিন জন ধরাধরি করে মহিলাটিকে নিয়ে এল। মহিলার বয়স প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে। মহিলাটি ঠাকুরের কাছে এসেই মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর একটু হাসি হাসি মুখে বললো, 'তোকে না বর্মায় দেখেছি? কেমন আছিস? ভাল আছিস তো?' ঠাকুরও তার প্রথম সম্ভাষণ সাদরে গ্রহণ করে বললেন, "হ্যাঁ, ভাল আছি। তুমি ভাল আছ তো?" মহিলা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলো, 'তুই নাকি আমাকে ভাল করবি শুনলাম? আমি কি ভাল হব? কেউ আমাকে ভাল করতে পারবে না।'

মহিলাটির আচরণ অদ্ভুত - কখনও হাসছে, কখনও কাঁদছে, কখনও পাগলামি করছে, আবার কখনও স্বাভাবিক। তার ছেলেমেয়েরা তাকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাকুর যদুনাথ রায়কে ডেকে বললেন, 'এক কাজ কর। তুমি একটা মাদুলি নিয়ে এস এবং এই ফুলটি তার মধ্যে ভরে দাও।' এই কথা বলে ঠাকুর যদুনাথ রায়ের হাতে একটি ফুল দিলেন। যদুবাবু বেরিয়ে গেলেন এবং

কিছুক্ষণ পরে মাদুলিটির ভিতর ফুলটি ভরে মোম দিয়ে মুখবন্ধ করে নিয়ে এসে ঠাকুরের হাতে দিলেন। ঠাকুর মহিলাটিকে ডাকলেন এবং তার হাতে মাদুলিটি দিয়ে বললেন, 'আমি তোমার এমন কিছু পাচ্ছি না, যার জন্য তোমার অন্য শক্তির প্রয়োজন। তোমার যেমন পাগলামি হাল্কা, তেমনি ওষুধও হালকা দিচ্ছি। কিন্তু ওষুধটা একমাত্র কার্যকরী হবে, যদি তুমি সতী বলে গণ্য হয়ে থাক। অসতীর পক্ষে এটা কার্যকরী হবে না।'

মহিলার সাথে যারা এসেছিল, তাদের একান্তে ডেকে বললেন, "তোমরা জেনে রাখ, এটা সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট (মানসিক চিকিৎসা) করলাম। কারণ এটা যদি কার্যকরী না হয়, তখন যাতে মায়ের উপর তোমাদের খারাপ ধারণা না হয়, সেইজন্যই আগে থেকে খোলাখুলিভাবে সব বুঝিয়ে বলে দিলাম।" হঠাৎ মহিলাটি মাদুলিটি হাতে নিয়ে বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়লো। তারপর তারা ঠাকুরকে প্রণাম করে চলে গেল। এর প্রায় সাত-আটদিন পরে হঠাৎ সেই ভদ্রলোক, যে মহিলাটিকে নিয়ে এসেছিল, ঠাকুরের কাছে এসে জানাল যে, ওই মহিলা সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এখন আর কোন পাগলামি নেই। ঠাকুর একটু হেসে বললেন, "না ধরে তো উপায় নেই - ওষুধ তো কাজ করবেই। অসতী যাতে না হয়ে পড়ে তার চিন্তাতেই ওর পাগলামি বন্ধ করতে হয়েছে।" তিনি আরও বললেন, "যেভাবেই হোক শক্তিকে নানাভাবেই প্রকাশ করা যায় এবং প্রত্যেকটি ট্রিটমেন্টই শক্তির প্রকাশ। যে পদ্ধতিই হোক, যেভাবেই হোক - চিন্তাশক্তিরই পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। শুধু বুঝে বুঝে কাজ করে যাওয়া - ক্ষেত্র বুঝে বীজদান।"

হঠাৎ ঠাকুর একদিন কালা ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে নারায়ণগঞ্জে গেলেন। আচার্যদের বাড়িতে উঠেছেন। আচার্যবাড়ির ছোট ছেলে রবীন ক্লাস ফাইভে পড়ে। বয়স প্রায় দশ বছর। গত কুড়ি দিন যাবৎ টাইফয়েড রোগে ভুগছে। টাইফয়েডের তেমন ভাল ওষুধ তখনও বের হয়নি। সুতরাং টাইফয়েড হলে জীবন-মৃত্যু সমস্যা। জিতেন ডাক্তারই দেখছিল। কিন্তু জ্বর কিছুতেই কমছে না দেখে এখানকার সবচেয়ে বড় ডাক্তার প্রিয়নাথ গুহকে দেখান হচ্ছে। নারায়ণগঞ্জে প্রিয়নাথ ডাক্তারের খুব নামডাক। মা শৈবলিনী দেবী খুব উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, ছেলের জ্বর তখনও ১০৩ ডিগ্রী। ঠাকুরকে অসুখের কথা জানালেন। ঠাকুর বললেন, "এক কাজ কর। কাঁচা

হলুদ দিয়ে খিচুড়ি করে ওকে খাইয়ে দাও। মুসুরীর ডাল আর চাল দেবে, পেঁয়াজ রসুন না। খিচুড়ি খেয়ে ভাল করে এক ঘুম দিক, তাহলেই সেরে যাবে।" তখনই খিচুড়ি তৈরী করে ছেলেটিকে খাওয়ান হ'ল। এক ঘুম দেবার পর বেলা তিনটের সময় ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল। এত ঘাম হতে লাগল যে, পাঁচ-ছয়বার জামা প্যান্ট বদলেও ছেলেকে শুকনো রাখা যাচ্ছিল না। সন্ধ্যাবেলা জিতেন ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে প্রিয়নাথ ডাক্তার এলেন। জ্বর ছেড়ে গেছে দেখে তিনি খুশি, জিজ্ঞাসা করলেন, 'পথ্য কি দিয়েছেন?' ওর মা বললেন, 'কাঁচা হলুদ দিয়ে খিচুড়ি করে খাইয়েছি।' শুনেই ডাক্তার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, 'মা হয়ে ছেলেকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করছেন! কে বলেছে খিচুড়ি দিতে?' মা বললেন, 'গুরুদেব বলেছেন।' 'ঠিক আছে, আপনার বাড়িতে আর আমি কোনদিন আসবো না', বলে ডাক্তার বেরিয়ে যাবার সময় পাশের ঘরে আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলেন, বাইশ তেইশ বছরের যুবক ঠাকুরকে। মা এসে সব কথা জানালেন ঠাকুরকে। ঠাকুর একটু মুচকি হেসে বললেন, 'ওর আর আসার প্রয়োজন হবে না। রবীন[1][বহুদিন পরের কথা। রবীন্দ্র আচার্য তখন ব্যারাকপুরে থাকে। রেলের গার্ড - কন্ট্রোলে আছে। খাওয়া-দাওয়া অনিয়মিত। পেটে ক্রমাগত একটা যন্ত্রণা হতে লাগলো। ঠাকুরকে মাঝে মাঝে বলেন। ঠাকুর কিছু বলেন না। ব্যথা এমন পর্যায়ে উঠলো যে, হাসপাতালে গিয়ে দেখালেন। বি.আর.সিং হাসপাতালে ডঃ Kundu বললেন - পেপটিক আলসার হয়েছে, অপারেশন করতে হবে। তখন ১৯৭২ সাল, ঠাকুর সুখচরে আছেন। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ঠাকুরকে এসে বললো, 'ঠাকুর, হয় তুমি কিছু কর, না হয় আমাকে এই তেতলা থেকে লাফ দিয়ে পড়তে হবে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।' 'দেখি কোথায় ব্যথা' বলে নাভির উপরে ঠিক ব্যথার জায়গাটিতে দু'তিনবার টিপে ঠাকুর বললেন, 'ঠিক আছে, যা। একটু ওষুধ খাস।' 'কি ওষুধ খাব ঠাকুর ?' - রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা করে। 'এক বোতল Liv-52(লিভ-৫২) খাস' ঠাকুর বলেন। বাড়ি যাবার পথে সেদিন আর রবীন্দ্র আচার্য কোন ব্যথা অনুভব করলো না। সেই যে ব্যথা সেরেছে আজও তার কোন অসুবিধা নেই।

একদিন সবশেষে রবীন্দ্র প্রণাম করে উঠেছে। ঠাকুর বললেন, ' এ সব কি হচ্ছে?' সে বুঝতে পারে না, জিজ্ঞেস করে 'কি ঠাকুর?' কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঠাকুর বললেন, 'ওসব খাবি না।' রবীন্দ্র

এবার বুঝতে পারলো যে, বন্ধুদের পাল্লায় পরে পরিশ্রান্ত হয়ে মাঝে মাঝে একটু যে পানীয় খায়, সেটার কথাই ঠাকুর বলছেন। কিন্তু কি করে ঠাকুর জানলেন? যাই হোক, সে বললো, 'তুমি বললে যখন, আর খাব না।'] এখন ভাল হয়ে গেছে।' কালা ডাক্তার[2] [কালা ডাক্তার - ধীরেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার] ঠাকুরের কার্যকলাপ দেখে কিছুটা অভ্যস্ত, সুতরাং তিনিও একটু হাসলেন।

প্রতিদিনকার মত বহু দর্শনার্থী এসেছে ঠাকুরের স্বামীবাগের বাড়িতে। অনেকেই দীক্ষা গ্রহণ করছে। এমন সময় একটি লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে উপস্থিত। লোকটির পায়ে সাংঘাতিক ঘা, তার পা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রস পড়ছে। পায়ের আঙ্গুলগুলো প্রায় খসে পড়ার উপক্রম হয়েছে – ভীষণ দুর্গন্ধ। লোকটি ঠাকুরকে জানালো যে তার গলিত কুষ্ঠ। সে ক্রমশঃ এগিয়ে এসে ঠাকুরের কাছে কান্নাকাটি করতে লাগল। ঠাকুর তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করে সব কথা জানলেন এবং তাকে পরীক্ষা করার জন্য কতকগুলো কঠিন ব্যবস্থা দিলেন। লোকটি সব ব্যবস্থাই সহজভাবে মেনে নিতে রাজী। এইভাবে একটা একটা করে ঠাকুর তার মনের বলের পরিচয় নিলেন। তাকে কতকগুলো পথ্যের ব্যবস্থা দিলেন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য কতকগুলি নিয়ম বলে দিলেন। তারপর এক গ্লাস জলে আঙ্গুল স্পর্শ করে ওর হাতে দিয়ে ঠাকুর বললেন, 'এটা খেলে তোমার রোগের উপশম অনিবার্য।' দশদিন নিয়মপালন করে একেবারে সাধারণ সুস্থ লোকের মত হেঁটে এসে সে উপস্থিত। ঠাকুরের জন্য অনেক ফুল নিয়ে এসেছে। ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে সে বললো, 'আপনার অশেষ কৃপায় আমি ভাল হয়ে গেছি।'

ঠাকুর বললেন, "মনের বলেই সব কিছু সম্ভব। মনের শক্তি যদি থাকে, সব কিছুই সম্ভব হয়। আমি যে চিন্তাশক্তিতে দিয়েছি, আর তুমি যে চিন্তাশক্তিতে গ্রহণ করেছ এবং প্রয়োগ করেছ, সেই মনের বলেই ও একাগ্রতাতেই ক্রমশঃ ক্রমশঃ ঐ সমস্ত জীবাণুগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শক্তি উভয়েরই থাকা দরকার - যিনি করেন ও যিনি নেবেন। আবার যদি তা নাও থাকে, যেমন যদি শিশু হতো, যিনি দেবেন তাঁর বিশ্বাস তার উপর যদি সম্পূর্ণ থাকে, তবে উপশম হতে বাধ্য। কারণ, সাধারণতঃ যত চিৎকারই করুক না কেন, একটা সন্দিগ্ধতা থেকে যায়। এই যে দেওয়া হ'ল,

'সফল হবে কিনা' সেই বিষয়ে একটা সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব নিজের মধ্যে এমনিভাবে খেলতে থাকে যে, ওটা কার্যকরীও শেষ পর্যন্ত সেইভাবেই হয়ে থাকে।"

"তাই যে কোন ব্যক্তির যদি নিজের উপর আস্থা থাকে, নিজের চিন্তায় যদি সম্পূর্ণ বিলীন থাকে, বাইরের কার্য ও ভিতরের সমস্ত ক্ষমতা রক্ষা করে যদি চলতে পারে, তবেই বাস্তবের সব কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব। শক্তি যার উপরই প্রয়োগ করুক না কেন, তার সাড়া সে পাবেই। তার জন্যই তো প্রথমে সাধনা করতে হবে। নিজের চিন্তাধারার উপর, নিজের বলের উপর এমনিভাবে মনঃসংযোগ করতে হবে যে, তার কার্যের উপর সে যেন সর্বদা তৃপ্ত থাকে। সেই তৃপ্তি যদি সে সর্বতোভাবে ধরে রাখতে পারে, তবেই মনঃশক্তির পরিচয় সব সময় দিয়ে যেতে পারবে। বাইরের হাসি কিংবা গতিবিধিতে তৃপ্তি নয়, তৃপ্তি হচ্ছে নিজের মনের সূক্ষ্মকোণে। যেমন একলা মনে, একা ঘরে, যে কোন অবস্থায় তুমি থাক না কেন, নিজের তৃপ্তিতে নিজেই রয়েছ - মন কোন সন্দিগ্ধ ক্ষেত্রে যায়নি। তবেই হবে সাধনার প্রকৃত কার্য। সেই জন্যেই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সত্য এবং জ্ঞান সমভাবে যে নিয়ে চলবে এবং সর্বতোভাবে যদি সূক্ষ্মেও সেই পরিচয় দিয়ে যেতে পারে, কি মনে কি বাইরে – সফলতা অনিবার্য। মনঃশক্তি (will force) তখনই আসবে। আজ সন্দিগ্ধতার মাঝে, অতৃপ্তির মাঝে নিজের দ্বন্দ্বে নিজেই জ্বলছে, নিজের দ্বন্দ্বে নিজেই রয়েছে। যত আনন্দ, যত স্ফূর্তি, যাই হোক না কেন - এ যেন বাইরের একটা আলগা উচ্ছাস, কিন্তু বস্তুতঃ সত্য যেন বহু দূরে রয়েছে, জ্ঞান যেন বহু দূরে। জিনিসকে খুঁজতে হবে। তেল সরবরাহ করবার জন্য যেমন 'হ্যাজাগ লাইটের' ছিদ্রকে 'পিন' করতে হয় এবং সেই তেলে বাতি যেমন খুব উজ্জ্বলভাবে আলোকিত হয়ে ওঠে, সেইভাবে মনের সূক্ষ্মকোণে যে অতৃপ্তিরূপ অজ্ঞানতা রয়েছে, জ্ঞানরূপ সূক্ষ্ম-পিন দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে দিতে হবে। তবেই তেল আপনমনে বিরাজ করবে। জ্ঞানালোকে আলোকিত তখনই হবে। সূক্ষ্ম চিন্তাতে যেতে হবে।- এইভাবে শক্তি যখন সঞ্চিত হবে, বিকাশ হবে, তখন তোমার প্রভাব যে কোন কিছুর উপর চালাতে পারবে। তখন তোমার আনন্দে, তোমার সত্যের উন্মাদনায় তুমি নিজেই বিভোর হয়ে থাকবে। হরিণ যেমন নিজের কস্তুরীর গন্ধে নিজেই উন্মাদ হয়ে ছুটতে থাকে – কোথায়?..... কোথায়? কি যেন একটা ব্যতিব্যস্ততার মধ্যে

চলতে থাকে – ঠিক তেমনি তোমার সেই চিদানন্দ, সেই মহানন্দ, তোমার জ্ঞানে ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত যে ধারা চলবে, তার সেই ধারা এমনি ধারা, যে ধারা তোমাকে এমনি করে ধাবমান করে নেবে। তুমি তার উন্মাদনায় নিজেই যেন ব্যতিব্যস্ত থাকবে। সেই ব্যতিব্যস্ততায় বিরাট শান্তি আছে, বিরাট শক্তি আছে। কারণ সত্যান্বেষী হয়ে সত্যের সন্ধানে এগিয়ে যেতে থাকবে। তখন তুমি সত্যময় হয়ে, জ্ঞানময় হয়ে আলোকিত থাকবে ও করবে। তখন প্রভাব আপনাআপনি হবে। তাই মহানরা মন সংযম করে, সমস্ত শক্তিকে এইভাবে সঞ্চয় করে, এই ভাবেই পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। সেই শক্তি তোমাদের ভিতরেও রয়েছে। তাই তোমরা নিজেকে নিজে খোঁজ, নিজের তৃপ্তিতে নিজে প্রতিষ্ঠিত হও, সত্যে প্রতিষ্ঠিত হও। তোমরা নিজেকে জানতে চেষ্টা কর – সেই সাধনার জন্যই বিশ্বরূপ। এই রূপকে বিভিন্নতার মধ্যে মানুষ ধ্যান করে, ধারণা করে নিজেকেই বিকশিত করতে চেষ্টা করছে। তোমরা নিজেকে নিজে পূজা কর, তারই মূলমন্ত্র জপ কর। সেই মূলমন্ত্র হচ্ছে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শক্তি - একটি শব্দে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার সর্ব শব্দই যে মূলমন্ত্র। সেই শক্তিকে পুনঃ পুনঃ জপ করলে তোমার মনের সমস্ত বৃত্তিগুলো সেই অর্থবোধে গিয়ে গিয়ে এগিয়ে যেতে থাকবে। তোমার সমস্ত অণু-পরমাণু এমন একটা অবস্থায় গিয়ে পৌঁছবে - মূল তুমিই, মূল যে তুমিই - তুমিই তোমাকে পরিস্ফুটিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছো। মূল যে তুমিই - তোমাতে আর মূলেতে এক অন্তরে রয়েছে, এক মূলেতে রয়েছে। তাকে চিন্তা করতে তোমাকেই যে প্রকারান্তরে জানছো। ঠিক দর্পণে যেমন নিজেকে তৈরী করছো, সেভাবে তোমাকেই তুমি দেখছো। দর্পণ শুধু তোমাকে দেখিয়ে দেবার কার্য করছে। তুমিই দর্পণে রয়েছ, তুমিই তোমাকে সংশোধন করছো। মূলমন্ত্র দর্পণ স্বরূপ, তুমিই তার ভিতর উদ্ভাসিত করছো, তোমাকেই তার ভিতর দেখছো। তুমিই তৈরী হচ্ছো, তোমার জপ তুমি করছো। কি দর্পণ, কি মূর্তি, কি আরাধ্য, কি বিশ্বরূপ – সবই যে তোমার রূপ [শ্রীবীরেন্দ্রবাণী]।"

কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটছে। লোকের ভিড় রোজই হচ্ছে। একদিন একটি ছেলেকে নিয়ে তার বাবা [হরমোহন দে] এসেছে – ছেলেটি [রাখাল দে] উন্মাদ, সবসময় নগ্ন অবস্থায় থাকে। এর মধ্যে আরও অনেকে এসেছে, কেউ রোগ সারাবার জন্য, কেউ অন্য সমস্যা নিয়ে।

একজন আবার এসেছে স্বপ্নে মন্ত্র পেয়ে। অনেক জায়গা ঘুরেছে, কেউ সেই মন্ত্র বলে দিতে পারেনি। তাই ঠাকুরের নাম শুনে এসেছে। ঠাকুর বললেন, "বেশ তো, কাল আসবে।" তারপর ঠাকুর ঐ ছেলেটিকে কাছে আনতে বললেন, আর সবাইকে বাইরে একটু অপেক্ষা করতে বললেন। ছেলেটির বাবা, ভাই আর কয়েকজন ভক্ত যারা সর্বদা কাছে কাছে থাকে, এইরকম কয়জন রয়ে গেল। ঠাকুর ভক্তদের মধ্যে দুই তিনজনকে ডেকে বললেন, "তোরা ওই ঘরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে নগ্ন অবস্থায় বসে থাক। তোরা পাগলের সাথে সাথে চিৎকার করবি, পাগল যা যা করবে, ঠিক তাই তাই করবি। তারপর জল পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তোরা তো ভাল আছিসই, তোরা জল খেয়ে কাপড় পরে এসে পড়বি।" ভক্তেরা ঠাকুরের নির্দেশমত সেই ঘরে গিয়ে বসে রইল। সব জানালা বন্ধ, দরজা একটু ভেজানো। ঘরে শুধু একটি আলো আছে। একটু পরেই ঠাকুর সেই পাগল ছেলেটি, তার বাবা ও ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। দরজা ভেজিয়ে ঠাকুর অন্যত্র একটু বসলেন। পাগল চিৎকার করছে, সাথে সাথে ওই উলঙ্গ ভক্তেরাও চিৎকার করছে। দুই চিৎকারে বেশ জমে গেছে। ভক্তেরা নিজেরাই হাসছে নিজেদের রূপ দেখে। তাদের হাসিও উন্মত্ততার মধ্যে মিশে গেছে। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর জল পাঠিয়ে দিলেন। ভক্তেরা জল খেল। জল খেয়ে যেন তারা ভাল হয়ে গেল, কাপড় পরলো। পাগলটিও ওদের দেখাদেখি বলে উঠলো, "আমার কাপড়?" ঠাকুর আগেই ওর জন্য কাপড় ঠিক করে রেখেছিলেন। ভক্তেরা ওকে কাপড়টা দিল। দেওয়ামাত্রই ও কাপড়টা পরে ফেলল। তারপর পাগলটির সাথে ভক্তেরা গল্প করলো। কে বলবে যে ও উন্মাদ ছিল! ব্যাপারটা ভক্তদের কাছে একটু অদ্ভুত মনে হ'ল। তারপর ওরা চারজন ভদ্রভাবে বের হ'ল। ভক্তেরা গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করলো, পাগলটিও প্রণাম করলো। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাম কি? তোমার বাড়ি কোথায়?" সে সব কথারই উত্তর স্বাভাবিকভাবে দিল। ওর বাবা ও ভাই অশ্রুসজল নেত্রে ঠাকুরের পায়ে পড়লো। ঠাকুর বললেন, "এ কিছুই তো নয়। মস্তিষ্কের বিকৃতির কারণ উদ্ভাবন করতে পারলেই তো হয়।" ওরা দীক্ষা গ্রহণ করে চলে গেল। [শ্রীবীরেন্দ্রবাণী]

বালক ঠাকুরের নাম বেশ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। অনেকের তাঁকে দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছে। অনেকে আবার শুধু নাম শুনেছে আর তাঁর অলৌকিক শক্তির কথা শুনেছে। তাই

যেদিন সেই 'ভরে পড়া' মহিলাটিকে দেখতে গেলেন, ঠাকুরের পরনে ছিল ধোপদুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবী, সেখানে প্রথমে কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। কিন্তু তাঁর কথায় বার্তায় বুঝে নিয়েছিল যে, তিনি সাধারণ দর্শক নন। ঠাকুরের কথায় যখন মহিলাটি 'দশায় পড়া' ভাব থেকে উঠে গিয়ে স্নানাহার করলো, তখন সকলের চমক লাগলো, 'ইনি কে?' শেষে পরিচয় পেয়ে সবাই তাঁকে প্রণাম করতে শুরু করলো। মহিলাটিও শেষে 'দশায়' পড়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য অপরাধ স্বীকার করে ঠাকুরের আশ্রয় প্রার্থনা করলো। যেদিকে যান, ঠাকুর হুঁশিয়ার করে দেন মানুষকে – 'ভরে পড়া', 'দশায় পড়া' এর মধ্যে যেমন কোন সত্যিকারের সারবস্তু নেই, তেমনি শনি-রাহুর প্রকোপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যাগযজ্ঞ করার মধ্যেও কোন সমাধান নেই। মানুষের মনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যারা এইসব পথ পদ্ধতি ধরেছে, তারা শুধু সমাজকে বিভ্রান্ত করছে। এই পথে কোন সুরাহা নেই।

বালক ঠাকুরের প্রভাব ক্রমে ছড়াতে থাকে। দলে দলে মানুষ আসে তাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষায়, দীক্ষা গ্রহণ করে জন্ম সার্থক করে। অশ্বিনী চ্যাটার্জী তখন প্রায়ই ঠাকুরের মা-কে বলতেন, "ঠাকুমা, আপনি কি হাতিকে বোতলে ভরে রাখতে চান? এই অশ্বিনী বহু পাহাড় পর্বত ঘুরেছে, বহু সাধু সন্ন্যাসী দেখেছে, কেউ একে টলাতে পারেনি। উনি (ঠাকুর) মানুষ ন'ন ঠাকুমা, উনি মানুষ ন'ন। লক্ষ লক্ষ মানুষ ওঁর পায়ে গড়াগড়ি দেবে।" বর্ষীয়ান এই ভক্তটিকে ঠাকুরের মা শ্রদ্ধা করতেন। প্রায় আশির কাছে বয়স, তবু তিনি সর্বদাই ঠাকুরের সুখসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে চলতেন। একদিন অশ্বিনী চ্যাটার্জীকে ঠাকুরের ঘরের টিনের চালের উপর দুপুর রৌদ্রের মধ্যে দেখে, ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওখানে কি করছেন?' অশ্বিনী চ্যাটার্জী উত্তর দেন, 'চৈত্রমাসের রোদে টিনগুলো গরম হয়ে গেছে, বাবার গরম লাগবে। তাই ছালা ভিজিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছি।' ঠাকুরের মা আশ্চর্য হয়ে সবাইকে বলেন, 'কি পরিমাণ গুরুভক্তি থাকলে এই বৃদ্ধবয়সে ঠাকুরের যাতে কোন কষ্ট না হয়, তার জন্য এত তৎপর হতে পারে।'

একদিন অশ্বিনী চ্যাটার্জী, যোগেশ রায়চৌধুরী, চিন্তাহরণ দে, মহেন্দ্রবাবু সবাই এসেছেন। অশ্বিনী চ্যাটার্জী, যোগেশ রায়চৌধুরী পাশাপাশি বসে আছেন, কিন্তু কেউ কাউকে চিনতে

পারেন না। ঠাকুর বললেন, 'দেখতো, চিনতে পার কি না।' অশ্বিনী চ্যাটার্জী অনেকক্ষণ ধরে যোগেশ রায়চৌধুরীকে দেখেও চিনতে পারলেন না। শেষে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নাম?' উত্তর এল, 'যোগেশ।' 'যোগেশ'! কোন্ যোগেশ?' অশ্বিনী চ্যাটার্জী জিজ্ঞাসা করেন। এতক্ষণে যোগেশ রায়চৌধুরীর মনে পড়লো, 'আপনি কি সেই অশ্বিনীদা, যিনি লোকনাথ বাবার কাছে থাকতেন, তাঁর রান্না করতেন, সেবাশুশ্রূষা করতেন?' অশ্বিনী চ্যাটার্জীরও মনে পড়ে গেল সেই ছেলেটির কথা, তারও নাম যোগেশ ছিল। রোজ আসতো লোকনাথ বাবার কাছে, নানারকম কাজ করে দিত। অশ্বিনী চ্যাটার্জী এবার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, 'ও, তুই সেই যোগেশ! লোকনাথ বাবার কাছে আমরা একসঙ্গে ছিলাম।' দুই বৃদ্ধের চোখেই আনন্দাশ্রু। দুজন দুজনকে জড়িয়ে আনন্দের কান্না কাঁদতে লাগলেন। 'যাক, ভালই হয়েছে। আমরা দুজনেই বালক বাবার আশ্রয় পেয়েছি।' অশ্বিনী চ্যাটার্জীর কথায় আনন্দের সুর। দুই বৃদ্ধ লোকনাথ বাবার আশীর্বাদে কী করে বালক ঠাকুরের আশ্রয় পেলেন, আনন্দে আত্মহারা হয়ে সেই কথা বলতে লাগলেন। কথায় কথায় আর একটি ছেলের কথা উঠলো। সেও তখন লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কাছে যাতায়াত করতো। যোগেশ চৌধুরী জানালেন যে, সেদিনের সেই ছেলেটি আজ ঢাকায় 'ললিত সাধু' বলে পরিচিত। সাধনায় সে বুঁদ হয়ে আছে, উত্থানশক্তিরহিত হয়ে গেছে। সেও আজ বালক বাবার আশ্রিত। অশ্বিনী চ্যাটার্জী শুনে খুব খুশি হলেন, 'যাক, আমরা তিনজন ছিলাম তখন লোকনাথ বাবার কাছে। তাঁর আশীর্বাদে তিনজনেই আমরা বালক বাবার কৃপালাভ করেছি, তাঁর আশ্রয় পেয়েছি। এর থেকে আর আনন্দের কী থাকতে পারে! 'ওহে যোগেশ, ওহে চিন্তাহরণ! আনন্দ কর, আনন্দ কর।' দুই বৃদ্ধ আনন্দের জোয়ারে ভাসছে দেখে ঠাকুর মুচকি হেসে বললেন, 'কী, হ'ল তো?' 'বাবা' বলে তিনজনেই ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

ঢাকায় স্বামীবাগে একদিন ঠাকুর বিভূতিতত্ত্ব নিয়ে আলাপ করছেন – কিভাবে মহাপুরুষেরা এক জায়গায় উপস্থিত থেকে অন্য একজায়গায় বা একসঙ্গে বহু জায়গায় দর্শন দিতে পারেন সেই সম্বন্ধে কথা বলছেন। বলছেন - "এই শক্তি সকলেরই আছে, সব জীবের মধ্যেই এই শক্তি অন্তর্নিহিত আছে – শুধু চর্চার অভাব।" এই সময়ে হাঁটতে, চলতে, বসতে, শুতে ঠাকুরের এত

বেশি বিভূতি দেখা যে'ত যে, এগুলো ভক্তদের কাছে ঠাকুরের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি বলে মনে হয়। সুতরাং তারা দেখে, তখনকার মত বিস্ময় প্রকাশ করে, কিন্তু তেমন গুরুত্ব দিয়ে ধরে রাখতে চেষ্টা করে না, বা লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। যে সব ভক্তেরা ঠাকুরের কাছে কাছে থাকে, তারা বেশির ভাগই তাঁর প্রায় সমবয়সী - সুতরাং ঠাকুর তাদের কাছে শুধু গুরু বা দেবতা নন, তিনি তাদের সখা, পরমহিতৈষী বন্ধু এবং উপদেষ্টা। প্রত্যেকেই তাই তাঁর উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, তাঁর আদেশ তাদের কাছে বেদবাক্য। প্রতিদিন এত ঘটনা ঘটে যায় যে, সেইগুলি যথাযথ ভাবে নোট করে লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য চাই অন্ততঃ তিন চারজন লোক যারা ছায়ার মত সব সময়ে ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে থেকে শুধু লেখার কাজেই ব্যস্ত থাকবে – সেরকম লোকেরই ছিল অভাব। যারা কাছে থাকে তাদেরও হয় পড়াশুনা, চাকুরী বা অন্যান্য কাজ ছিল, সুতরাং যতটা তারা পেরেছে স্মরণ করে লিপিবদ্ধ করেছে।

সেদিন এক ভক্ত এসেছে – এসেই ঠাকুরের চরণে পড়ে কাঁদতে শুরু করেছে। কি হয়েছে বলে না, শুধু কাঁদছে, 'আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে ঠাকুর, আমায় ভাল করে দিন।' কয়েকবার জিজ্ঞাসা করবার পর সে চাদরের তলা থেকে তার হাত বের করে দেখালো। ডান হাত প্লাস্টার করা - হাতে ফ্র্যাকচার হয়েছে। ঠাকুর একবার তাকিয়ে বললেন, "তোর কিছুই হয় নি, শুধু শুধু কাঁদছিস কেন?" ভক্তেরাও [অনিল সেন, বরুণ ঘোষ, ভূপেন রায়, রবি ঘোষ প্রভৃতি] হতবুদ্ধি হয়ে ভাবছে - কী ব্যাপার! ঠাকুর বলছেন কিছু হয়নি – সে কথা তারা ফেলতে পারছে না, অথচ লোকটির হাত প্লাস্টার করা, ব্যথাও আছে বেশ। লোকটি ঠাকুরের কোন কথাই শুনছে না, শুধু কাঁদছে – 'আমাকে ভাল করে দিন।' ঠাকুর কয়েকবার ওকে একই কথা বললেন, তারপর বিরক্ত হয়ে হাতের লাঠিটা দিয়ে ওর হাতে দু ঘা বসিয়ে দিলেন। যন্ত্রনায় চেঁচিয়ে উঠে ও বসে পড়লো। ঠাকুর এক ধমক দিলেন, "ওঠ, উঠে দাঁড়া।" ধমক খেয়ে ভক্তটি উঠে দাঁড়ালো। ঠাকুর বললেন, "যা, এক বালতি জল নিয়ে আয়।" লোকটি কি করবে বুঝতে পারছে না, একবার ঠাকুরের দিকে তাকাচ্ছে, আর একবার নিজের ভাঙ্গা হাতের দিকে তাকাচ্ছে। ধমকের চোট তখনও সামলাতে পারেনি – ভয়ে কাঁপছে। ভাবছে হাত তো ভেঙ্গেছেই, এরপর যদি ঠাকুরের কথা না শোনে, তিনি আবার মারবেন। তাই সে

ভয়ে অপর দুজন ভক্তের সঙ্গে নীচে নেমে গেল। ভক্তেরা এক বালতি জল ভরতি করে ওর হাতে দিল, "যাও, সিঁড়ি দিয়ে উপরে নিয়ে যাও।" নিরুপায় হয়ে সে বালতিটি তুলে নিল এবং আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো - দু'জন ভক্ত পিছে পিছে রইলো, যদি কিছু হয়। জলভরা বালতিটি নিয়ে গিয়ে ঠাকুরের কাছে রাখলো। ঠাকুর একটু হাসলেন, আর বললেন, 'ওর হাতের প্লাস্টারটা খুলে দেখতো কোথায় ভাঙ্গা।' দু'জন ভক্ত মিলে প্লাস্টারটা কেটে ফেললো, লোকটি একটু আঃ বা উঃ করলো না, সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাকুর এবার বললেন, "টিপে দেখতো কোথায় ভাঙ্গা।" ভক্তেরা টিপে দেখছে কোথাও অসমান নেই, লোকটিও কোন ব্যথা অনুভব করলো না। ঠাকুর বললেন, "বলেছি না, তোর কিছু হয়নি। যা বাড়ি যা।" হতবাক হয়ে ভক্তটি প্রণাম করে নেমে গেল।

আর একদিন মন্টু রায়ের বোন ফুলু রায় ঠাকুরের কাছে যাবে বলে বাড়ি থেকে রওনা হয়েছে। রাস্তায় আসতে আসতে দুই এক জায়গায় লোকের ভীড়ের মধ্যে দিয়েও আসতে হয়েছে । স্বামীবাগে ঠাকুর বাড়ি পৌঁছে দেখে যে তার গলার হার নেই। ঢাকা শহরে সবলোকই তো সৎ নয়। ভীড়ের মধ্য দিয়ে আসার সময়ে কেউ হারটা খুলে নিয়ে গেল, না রাস্তায় কোথায় পড়ে গেল ফুলু রায় বুঝতে পারে না। সোনার হারটা হারিয়ে মনটা তার খুব খারাপ, যে আনন্দ নিয়ে ঠাকুরের দর্শন করতে আসছিল, সে আনন্দ আর তার নেই। ঠাকুরকে জানাবার সাহসও তার নেই। মেয়েদের কাছে সোনা হারানো একটা অশুভ ইঙ্গিত, তাই মন তার ভারাক্রান্ত। ঠাকুমা(ঠাকুরের মা) ওকে জিজ্ঞেস করেন, "কিরে ফুলু, কি হয়েছে? এত মুখভার কেন?" ফুলু ঠাকুমার কাছেই যাচ্ছিল, ঠাকুমার প্রশ্নে ওর কাজ সহজ হয়ে গেল, বললো, "ঠাকুমা, আসার পথে গলার হারটা খোওয়া গেছে, রাস্তায় পড়েই গেল, না কেউ খুলে নিল বুঝতে পারছি না।" ঠাকুমা বললেন, 'ঠাকুরকে জানা, চল আমি বইলা আসি।' দোতলার ঘরে ঠাকুর খাটের উপর বসে আছেন – দুই একজন ভক্ত কাজ করছে। প্রণাম করে ফুলু দাঁড়ালো। ঠাকুমা বললেন, "ফুলুর গলার হারটা রাস্তায় পইড়া গেছে। ওর হারটা আইনা দে না।" ঠাকুর বললেন, "দেখি, কি করতে পারি।" ঠাকুর বালিশের তলায় হাত দিয়ে একটা হার বার করলেন, বললেন, "দেখতো, এইটা তোর হার নাকি?" ফুলু আশ্চর্য হয়ে বললো, "হ্যাঁ এইটাই

তো।" ঠাকুর বললেন, "নে। এবার থেকে সাবধানে চলাফেরা করবি।" সবাই অবাক হয়ে গেল, এর মধ্যে কেউ আসে নি যে, ঠাকুরের হাতে হারটা দিয়ে যাবে, অথচ ঠাকুর বালিশের তলায় হাত দিয়ে হারটি বার করে দিলেন কি করে!

গ্রামে-গঞ্জে চায়ের প্রচলন নেই - তাই টি মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড থেকে বিনামূল্যে তৈরী চা বিলি করবার এবং তৈরী করার পদ্ধতি শেখাবার ব্যবস্থা করা হ'ল। যুবকটি [দ্বিজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী] এই সংস্থায় চাকরি পেয়ে খুলনার সাতক্ষীরায় কাজে যোগ দিল। নৌকায় করে গ্রামে-গঞ্জে যায় আর গ্রামবাসীদের চায়ের স্বাদ শেখায়। ভালই লাগছিল কাজ - কিন্তু ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান, দীর্ঘ বারো বছর ধরে মায়ের সাথে নিরামিষ আহার করে, সুতরাং কি করে সে সব সংস্কার বিসর্জন দিয়ে মুসলমানের হাতে খায়! তিন দিন অভুক্ত থেকে শেষে মুসলমানের আমিষ অন্ন গ্রহণ করতে শুরু করলো। একজন গ্রামবাসী সতর্ক করে দিয়েছিল যে, সুন্দরবনের মর্তমান কলা খাবেন না। যুবকটি মর্তমান কলা আর মধুও খেতে লাগলো। অনভ্যস্ত আমিষ খাবার খেয়ে সে কিছুদিনের মধ্যেই ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লো। একদিকে জ্বর, আর একদিকে উদরাময়। ডাক্তারের ওষুধেও জ্বর কিছুতেই কমে না, ১০৩/৪ ডিগ্রি জ্বর হতে থাকে। জ্বরের ঘোরে একদিন যুবক দেখে যে, ঠাকুরের কোলে মাথা দিয়ে সে শুয়ে আছে আর ঠাকুর তার গায়ে হাত বুলাচ্ছেন। আশ্চর্যভাবে তার পরদিনই ওর জ্বর ও উদরাময় কমে গেল, কিন্তু সে খুব কাহিল হয়ে পড়লো।

কয়েকদিনের মধ্যেই সে ঢাকা রওনা হ'ল এবং ঠাকুরকে দর্শন করতে গেল। ঠাকুর বললেন, "খুব কাহিল হয়ে পড়েছিস, না?" যুবক উত্তর দেয়, "আরও আছে নাকি?" ঠাকুর বললেন, "আর একটু।" পাঁচ ছয়দিন পরেই আবার সে জ্বরে পড়লো – ভীষণ জ্বর। ঢাকার এক নামকরা বড় ডাক্তারকে ডাকা হ'ল কারণ স্থানীয় চিকিৎসক ভরসা পাচ্ছিল না। তিন-চারদিন পরে রক্তবমি শুরু হ'ল - সেই রক্তবমি দেখে বাড়ির সকলেই ভয় পেয়ে গেল; ডাক্তাররাও বেশি ভরসা পায় না। ক্রমে নাড়ী ছেড়ে দিল - ডাক্তাররাও আশা ছেড়ে দিলেন, 'যদি বাঁচে তবে নিতান্ত বরাতজোরে।' তবু চেষ্টা করে দেখছেন। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে তাঁরা জবাব দিয়ে গেলেন। রোগীর প্রায় শেষ অবস্থা। ঠাকুরের কাছে তখনই লোক পাঠানো হ'ল - ঠাকুর বললেন, "ও কিছুতেই আমাকে ছাড়ছে না।

ফিরে গিয়ে আর দেখতে পাবে কিনা সন্দেহ। তবু যে অবস্থায়ই গিয়ে দেখ না কেন, এই ফুলটি ওর মাথার বালিশের নীচে রেখে দিও।" বাড়িতে ফিরে দেখে রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা, হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে। ডাক্তার জবাব দিয়ে চলে গেছেন। যাই হোক, ঠাকুরের নির্দেশমত ফুলটি বালিশের তলায় রেখে দেওয়া হ'ল। সবাই আসন্ন বিপদের কথা চিন্তা করে শোকাচ্ছন্ন। প্রায় আধঘন্টা কেটে গেছে - হঠাৎ ছেলেটি চোখ মেলে তাকালো। পরদিনই ঠাকুর এলেন, আর বললেন, "কি রে, বড় কাহিল হয়ে পড়েছিস, না!" সে যাত্রা ছেলেটি বেঁচে উঠলো।

বেঁচে উঠে ছেলেটি সংক্ষেপে তার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলে। যখন তার নাড়ী ছেড়ে যাচ্ছে, বাড়িতে কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেছে, সে দেখছে তার হাত পা, সমস্ত শরীর ছেড়ে দিচ্ছে, কোন অনুভূতি নেই। শুধু আলজিবটা নড়ছে - ক্রমাগত বীজমন্ত্র জপ চলছে। তারপর সেটাও যেন বন্ধ হয়ে আসছে - আর একটা তুলোর মত শুভ্র পদার্থ তার ভিতর থেকে বেরিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। এমন সময় এক বিরাট আলোর জ্যোতি এসে সেই শুভ্র পদার্থটিকে ঘিরে ফেললো এবং নীচের দিকে নামিয়ে নিয়ে বিছানায় পড়ে থাকা ওই দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। এত স্পষ্ট সে দৃশ্য যে, সে কোনদিনই তা ভুলতে পারবে না।

হরিবন্ধু রায়ের এম. এসসি. পরীক্ষা দেবার কথা। সেবার কিন্তু বাড়িতে অসুখ বিসুখের জন্য পড়াশুনা একেবারেই হয়নি। পরীক্ষার মাত্র আর একমাস বাকী; পরীক্ষা দেওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয় দেখে সে স্থির করেছে যে, সেবার পরীক্ষা দেবে না। ঠাকুরকে জানালো যে পড়াশুনা হয়নি, সুতরাং এবারের মত আর পরীক্ষা দেবে না। ঠাকুর কিন্তু তার ওজর-আপত্তি শুনলেন না, বললেন যে একমাস সময়ই যথেষ্ট, পরীক্ষা দিতে হবে। হরিবন্ধু ছিল বালক ঠাকুরের রান্নার ঠাকুর – সবাই তাকে 'ঠাকুরমশাই' বলে ডাকতো। আজও অনেক পুরানো ভক্তশিষ্য তাকে 'ঠাকুরমশাই' বলে ডাকে। প্রথমে সে ঠাকুরের কাছে একটা চাকরীও চেয়েছিল, শেষে ঠিক করেছিল যে, ঠাকুরের রান্না করেই জীবন কাটিয়ে দেবে। আজ সেই হরিবন্ধু এম. এসসি. পরীক্ষা দিতে চলেছে। ইতিমধ্যে ঠাকুর কলকাতায় এলেন, হরিবন্ধু গিয়ে দেখা করলো। ঠাকুর নির্দেশ দিলেন, "সারারাত ধরে সমস্ত বইয়ের পাতা উল্টে যাবে এবং পরীক্ষার হলে গিয়ে যখন প্রশ্নপত্র পাবে দুমিনিট আমার কথা স্মরণ

করবে। তারপর কোন চিন্তা না করে উত্তর লিখতে শুরু করবে, আর রিভাইস করবে না।" পরীক্ষা দেবার মত প্রিপারেশন হয়নি - একমাসে এম. এসসির বিরাট কোর্স শেষ করা সম্ভব নয়, তবু ঠাকুরের নির্দেশ পরীক্ষা দিতে হবে। হরিবন্ধু নিরুপায়, সারারাত ধরে বইয়ের পাতা উল্টে যায় – পরীক্ষার হলে ঢোকার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বই ছাড়ে না। প্রশ্নপত্র পেয়ে ঠাকুরের কথা চিন্তা করে কিছুক্ষণ, তারপর লিখতে শুরু করে - এক একটা পরীক্ষা শেষ হয় আর সে বিস্মিত হয়ে ভাবে – কি করে লিখলো। সারারাত ধরে পড়েছে, পরীক্ষার হলে যাওয়ার সময় মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে, ঠাকুরকে স্মরণ করে যেই লিখতে শুরু করে, কোথা থেকে সব উত্তর যে আসে সে নিজেই জানে না, কলম আর থামতে চায় না। টিফিনের সময়ে পরীক্ষার হল থেকে রাস্তায় বেরিয়ে দেখে ঠাকুরের গাড়ী – ঠাকুর বলেন, "মনে আছে তো, আমার কথা স্মরণ করে লিখতে শুরু করবে – এদিক-ওদিক তাকাবে না।" পরীক্ষা দিয়ে চললো হরিবন্ধু একের পর এক। রোজই টিফিনের সময়ে দেখে ঠাকুরের গাড়ী, রোজই তিনি এক কথা মনে করিয়ে দেন। পরীক্ষা শেষ হ'ল। এখন প্র্যাক্টিকাল পরীক্ষা - এবার ঠাকুর আবার বলে দিলেন, "নিজে যে রেজাল্ট পাবে তাই লিখে দিয়ে আসবে, অন্য কারোর সঙ্গে আলোচনা করবে না।" এবার কিন্তু সে একটা বিরাট ভুল করে ফেললো। আর দুজনের রেজাল্ট এক হয়েছে দেখে নিজের রেজাল্ট সম্বন্ধে তার সন্দেহ জাগলো এবং ওদের রেজাল্টটাই লিখে দিয়ে এল। ঠাকুর যখন শুনলেন যে হরিবন্ধু নিজের রেজাল্ট উপেক্ষা করে অন্যের রেজাল্ট লিখে দিয়ে এসেছে, তিনি বিরক্ত হলেন।..... ক্রমে এম. এসসি. পরীক্ষার ফল বে'র হল, হরিবন্ধু লিখিত পেপারগুলিতে ফার্স্ট হয়েছে, প্র্যাকটিকালে খারাপ করেছে। সুতরাং ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হতে পারলো না – ফার্স্টক্লাস সেকেন্ড হ'ল। এই ভাবে ঠাকুরের নির্দেশ ভুলে যাওয়ার খেসারৎ তাকে দিতে হ'ল।

হরিবন্ধু লেখাপড়ায় ভাল ছিল বলে ডাঃ মেঘনাদ সাহা তাকে খুব ভালবাসতেন। কিন্তু যেদিন তার কপালে ছোঁয়ানো টর্চের বাল্বটা ঠাকুরের পায়ের বুড়ো আঙ্গুল স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলো, সে বিস্মিত হয়ে মেঘনাদ সাহাকে জিজ্ঞেস করলো - কি করে এটা সম্ভব হ'ল। মেঘনাদ সাহা বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'হয় গুরু ছাড়, না হয় পড়া ছাড় – দুটো একসঙ্গে হয় না।'

বস্তুতঃ তিনি এই ঘটনা যে বাস্তবে ঘটতে পারে, বিশ্বাস করেননি। এম. এসসি. পরীক্ষা এবার হরিবন্ধু দিতে পারবে না, কারণ সাংসারিক কারণে তার পড়া হয়নি - এই তিনি জানতেন। তারপর যখন হরিবন্ধু পরীক্ষা দেবে বলে তিনি জানলেন – তিনি একটু বিস্মিত হলেন। তৈরী না হয়ে পরীক্ষা দেবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। সেখানেও যে গুরুর নির্দেশ কাজ করছে - সেটা তাঁর ভাল লাগলো না - একটা ভাল ছেলে এইভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেখানেই ছিল তাঁর ক্ষোভ। কিন্তু এম. এসসিতে হরিবন্ধুর অপ্রত্যাশিত ভাল রেজাল্ট দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন, মনে মনে ঠিক করলেন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করবেন। তারপর যখন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হ'ল - তিনি তাঁর কথায়, তাঁর বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব আলোচনায় অভিভূত হয়ে গেলেন, বললেন, "বহু পূর্বেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমার উচিত ছিল, তখন আমি বুঝি নাই।" ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করায় তিনি বললেন, "ধর্ম ও পরমার্থ ক্ষেত্রে শ্রীবালক ব্রহ্মচারীর সুস্পষ্ট নিরপেক্ষ যুক্তি ও ধারণা আমার নিকট অতিশয় হৃদয়গ্রাহী বলিয়া বোধ হয়। সূক্ষ্ম ভাবগর্ভ বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের বিশালতা ও সহজ সাধারণ দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা বুঝাইয়া দিবার দুর্লভ ক্ষমতা আমায় বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করে।" .....

ঢাকায় একটা ঘোড়ার গাড়ীতে ঠাকুর চলেছেন নবাবপুর দিয়ে - সঙ্গে দুই ভক্ত। ঢাকা জেলের পাশ দিয়ে ঘড় ঘড় করে গাড়ী চলেছে। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, "ওটা কি রে? ওই মোটা মোটা লোহার রডগুলো লাগিয়েছে কেন?" এক ভক্ত উত্তর দিল, "ওটা জেলখানা, ওই রডওয়ালা ঘরগুলো গারদ।" ঠাকুর বললেন, "আমাদেরও একদিন ওই রকম গারদে যেতে হবে। খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হবে।" [পাঁচ বছর পরে ১৯৫০ সালে, এক মিথ্যা অভিযোগে ঠাকুর এবং তাঁর কয়েকজন ভক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে নিয়ে যায়। মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট রায় দেন যে, অভিযোগটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ঠাকুর এবং তাঁর ভক্তদের সসম্মানে মুক্তি দেন। পুলিশ তাদের অন্যায় আচরণের জন্য ঠাকুরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।]

ঘোড়ার গাড়ী জেলখানা পেরিয়ে চললো, মন্টু রায়ের বাড়ির দিকে। মন্টু রায়ের পিতা মরণাপন্ন। ডাক্তাররা বলে গেছেন যে তাঁদের আর কিছু করার নেই, চিকিৎসা শাস্ত্রে যা যা করণীয়

ছিল সব তাঁরা চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কোনটাতেই কিছু হ'ল না। তাঁরা তাই আর কোন আশা দিতে পারছেন না। মন্টু রায় এসে তার পিতার অবস্থা ঠাকুরকে জানিয়েছে। ঠাকুর বললেন, "ঠিক আছে, আমি দেখতে যাব।"

মন্টু রায়ের বাড়ি পৌঁছে দেখলেন যে তার পিতার অবস্থা গুরুতর – আরোগ্য লাভ করার সম্ভাবনা সাধারণ দৃষ্টিতে নেই। ঠাকুর কিছুক্ষণ রোগীকে দেখলেন এবং কি হয়েছিল সব খবর নিলেন। এবার মন্টু রায়ের বাবার ভ্রূযুগলের মাঝে এক অঙ্গুলি দিয়ে চাপ দিলেন, বললেন, "এবার উঠে দাঁড়াও তো দেখি।" রোগী ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে – বোধ হয় ভাবছে যে, সে উঠে বসতেই পারে না, দাঁড়াবে কি করে? ঠাকুর আবার বললেন, "ওঠ, উঠে দাঁড়াও।" এবার চিন্তা না করে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। সবাই দেখে তো আশ্চর্য। রোগী নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছে - তবে কি তার রোগ ভাল হয়ে গেছে যে, উঠে দাঁড়াতে পারলো! ঠাকুর বোধ হয় তার মনের কথা বুঝতে পেরেই বললেন, "আর চিন্তা নেই, তুমি ভাল হয়ে গে'ছ।"

একদিন দর্শনের সময়ে একটি ছেলেকে [জীবনকৃষ্ণের পুত্র] নিয়ে এসেছে কয়েকজন লোক। ছেলেটির উপর নাকি কোন অপদেবতার অশুভ দৃষ্টি পড়েছে এবং তাকে আশ্রয় করে আছে। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই ছেলেটি দেখে, তার বিছানায় মশারীর তলায় একটি জবা ফুল কে যেন রেখে দিয়েছে, ফুলটা দেখেই তার অস্থিরতা বেড়ে যায়; স্বাভাবিক কাজকর্ম আর সে করতে পারে না। দিনের পর দিন একই ঘটনা ঘটে চলেছে এবং তার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ছে। অনেক ওঝা-বৈদ্য দেখিয়েছে, অনেক চিকিৎসা করিয়েছে - কিন্তু কোনটাতেই কিছু হচ্ছে না, শেষে ঠাকুরের কাছে নিয়ে এসেছে। ঠাকুর ওকে দু'চারটি কথা জিজ্ঞাসা করলেন – দেখা গেল ওর উত্তরের মধ্যে বেশ ঔদ্ধত্য রয়েছে। ঠাকুর এবার বেশ কড়াভাবে বললেন যে, এখনি যেন ওর দেহ থেকে বেরিয়ে যায়, তা না হলে তাঁকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। ঠাকুরের ধমকে যেন ছেলেটি একটু শান্ত হলো এবং বেরিয়ে যাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল। ঠাকুর এক ভক্তকে ডাকলেন। ভক্তটি এসে জিজ্ঞাসা করলো, 'কেন ডাকছো ঠাকুর?' তাকে নীচে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর আরেক ভক্তকে ডাকলেন - দ্বিতীয় ভক্তটি এসে সামনে বসলো। ঠাকুর তাকে জপ করতে বলেন এবং পরে একটি ফুল তার

কপালে ছোঁয়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তটির শরীর শিথিল হয়ে গেল - তাকে শুইয়ে দেওয়া হ'ল। ছেলেটিকে ভক্তটিকে ছুঁয়ে বসতে বললেন। কিছুক্ষন পরে দুটি পায়রা নেমে এল আর ভক্তটির চারিপাশে ঘুরতে লাগলো। ঠাকুর ছেলেটির পায়ে এবার একটা ফুল ছুঁড়ে মারলেন। ছেলেটি বিকট চিৎকার করে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল। একটু পরে পায়রা দুটো উড়ে ঘরের ঘুলঘুলিতে গিয়ে বসলো - ভক্তটিও উঠে বসলো। ছেলেটি আনন্দে ঠাকুরের চরণ ধরে বলতে লাগলো, "বাবা, আমি ভাল হয়ে গেছি।" ঠাকুর ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি দেখলি?" ছেলেটি বলে, "দেখলাম, একটা হতশ্রী বুড়ী ছুটে পালালো।" ছেলেটি এর পর সাতদিন আনন্দে আর ঠাকুরকে ছেড়ে যেতে চায় না। পরে ঠাকুর ভক্তদের জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হ'ল বুঝতে পারলি?" এক ভক্ত উত্তর দিল, "হ্যাঁ ঠাকুর, এটা Soul transfer(সোল ট্রান্সফার)। ভক্তের আত্মা পায়রা দুটির মধ্যে নিয়ে গেলে আর ছেলেটির মধ্যে যে দুষ্ট প্রেতাত্মা ছিল তাকে, ভক্তটির মাধ্যমে বের করে দিলে।" ঠাকুর সম্মতি জানালেন।

অশ্বিনী চ্যাটার্জীর সাধক হিসাবে বেশ নামডাক - তিনি বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কাছে অর্ধমন্ত্র পেয়ে তাঁর নির্দেশমত অপেক্ষা করে ছিলেন। প্রায় অর্ধশতাব্দী পর ঠাকুর তাঁর অর্ধমন্ত্র পূর্ণ করে দেন। তাঁর সঙ্গে থাকেন তাঁর প্রিয় সাথী চিন্তাহরণ দে।

সেদিন সকালে তিনি উঠেই ছেলের বৌকে ডাকলেন, "বৌমা, আজ আমি চলে যাব। একটু ভাল করে কয়েক পদ রান্না কোরো।" সন্ধ্যা-আহ্নিক করে সকালে জলখাবার খেলেন। তারপর দুপুরে স্নানের সময়ে বললেন, "আমাকে একটা নতুন কাপড় দাও, আজকে নতুন কাপড় পরবো।" স্নান করে খেতে বসলেন, বৌমা পরিবেশন করছে শ্বশুরমহাশয় তৃপ্তিসহকারে খাচ্ছেন দেখে সে খুশি। সুস্থ সবল দেহ – কোন বিশেষ রোগের চিহ্ন নেই, সুতরাং ছেলের বৌ শ্বশুর মহাশয়ের কথাটার কতটা গুরুত্ব দিয়েছিল তা বলা যায় না, তবে তিনি যা যা বলছেন সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাচ্ছে। যাকে যাকে খবর দিতে বলেছেন, সবাইকে খবর দিয়েছে। খেয়ে উঠে বললেন, "বৌমা, এবার আমি একটু শোব, বিছানা ঠিক করে একটা নতুন চাদর পেতে দাও আর

যাদের আসতে বলেছিলাম তাদের খবর দাও, আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে, আর বেশিক্ষণ নেই।"

বৌমা নতুন চাদর পেতে পরিপাটি করে বিছানা করে দিয়েছে, অশ্বিনী চ্যাটার্জী কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পরে শুদ্ধভাবে বিছানায় শুয়ে ইষ্টনাম জপ করতে লাগলেন। যাদের যাদের খবর দিতে বলেছিলেন - সবাই এসেছে। কলকাতায় থাকে এক ছেলে খগেন্দ্র – সে তখন তার সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর ব্যবস্থা করতে ছুটাছুটি করছে। তাকে এই মুহূর্তে জানাতে নিষেধ করলেন। পরে যখন খগেন্দ্র পিতার মৃত্যুসংবাদ পে'ল, সে বুঝতে পারলো যে, তার পিতা তার সমূহ সমস্যার কথা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তাকে জানাতে নিষেধ করেছিলেন। এদিকে অশ্বিনী চ্যাটার্জী যাকে যা বলবার বলে নিলেন। সবাই দাঁড়িয়ে দেখছে, ঠিক বুঝতে পারছে না – কি করে এই সুস্থ মানুষটি বলছেন যে তিনি চলে যাচ্ছেন। স্বচক্ষে যখন দেখলো, অশ্বিনী চ্যাটার্জী "আমার পা ছেড়ে দিয়েছে" বলার সঙ্গে সঙ্গে আর তিনি পা নাড়তে পারছেন না – পা দুটো অসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে - তখন সকলেই তাঁর কথার তাৎপর্য বুঝতে পারলো যে, সত্যিই তিনি দেহরক্ষা করছেন এবং বলে, কয়েই চলে যাচ্ছেন। ক্রমে অশ্বিনী চ্যাটার্জী বলছেন, 'কোমর পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে, এবং বুক হাত পর্যন্ত ধীরে ধীরে ছেড়ে দিচ্ছে আর বেশিক্ষণ কথা বলবার শক্তি থাকবে না। ছেলেরা যেন কেউ আমার মুখে জল না দেয় – আমার মুখে জল দেবে আমার গুরুভাই চিন্তাহরণ। লোকনাথ বাবা এসেছেন।" হঠাৎ একটি গোলাপ ফুল এসে পড়লো তাঁর বুকে, সঙ্গে সঙ্গে অশ্বিনী বলে উঠলেন, "বালক বাবা এসে গেছেন, আর সময় নেই - ঠাকুর ঠাকুর!" সকলে তাকিয়ে দেখলো বালক ঠাকুর আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। মুহূর্ত মাত্র – অশ্বিনী চ্যাটার্জী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। [মুন্সীগঞ্জের বাড়িতে অশ্বিনী চ্যাটার্জী দেহরক্ষা করেন] এদিকে ঠাকুর তখন ঢাকাতে – চট্টগ্রামে কয়েকদিন থেকে ফিরে এসেছেন। দোতলার ঘরে বসে তখন ঠাকুর আলাপ করছিলেন। মহম্মদ আলি মাঝে মাঝে দুই একটি প্রশ্ন করছিলো, আর সবাই মন দিয়ে ঠাকুরের কথা শুনছিল। আলাপের মধ্যে হঠাৎ ঠাকুর বলে উঠলেন, "অশ্বিনী চলে যাচ্ছে, আমি একটু ঘুরে আসি।"

খবরের কাগজে বড় বড় হরফে সংবাদ – প্লেন এক্সিডেন্টে নেতাজী মারা গেছেন সুদূর প্রাচ্যে। দেশের মানুষের মনে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে। নেতাজীর উপর ভরসা করে মানুষ বসেছিল যে, তিনিই একমাত্র দেশে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করে স্বাধীনতা আনতে পারেন। এরপর বেশ কিছু দিন কেটে গেছে। একদিন দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো, ভক্তেরা ধরলো, "ঠাকুর, তুমি কিছু আমাদের বলো। মুসলমানরা তো 'পাকিস্তান' বলে এক আলাদা রাষ্ট্র গড়তে চায় আর ইংরেজ তার সুযোগ নিয়ে আমাদের কোন সুযোগ সুবিধাই দিতে চাইবে না। এর থেকে কি অব্যাহতি পাব না?"

ঠাকুর – অব্যাহতি পাবি না কেন? ইংরেজরা বেশিদিন আর এদেশে থাকবে না। তবে ওরা যতদিন আছে, আমরা এখানে থাকতে পারবো। ওরা চলে গেলে আমাদেরও চলে যেতে হবে।

ভক্ত – কি বলছো ঠাকুর! ওরা চলে গেলে আমরা থাকতে পারবো না কেন?

ঠাকুর – ওই যে পাকিস্তান না কি বললি - ওটা আসছে। আমি চারদিকে শুধু লুঙ্গীপরা লোক দেখতে পাচ্ছি। পূর্ববঙ্গ মুসলমানের রাজত্ব হয়ে যাবে - এখানে আর আমাদের থাকা চলবে না। ওরা আমাদের থাকতে দেবে না।

মাতৃভূমি ছেড়ে যেতে হবে, ভাবতেও কষ্ট হয় - বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু ঠাকুরের মুখ থেকে এই কথা শুনে বিশ্বাস না করেও উপায় নেই। আসন্ন দুর্ভোগের কথা ভেবে সবাই বিমর্ষ হয়ে চুপ করে রইলো।

ঠাকুর ওদের বিমর্ষভাব দেখে বললেন, "এখনও কিছুটা দেরী আছে - মন খারাপ করে বসে থেকে কি লাভ, তার থেকে মানসিক প্রস্তুতি নেবার চেষ্টা কর। ইংরেজ চলে যাবে ঠিকই, তবে আমাদের কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে।"

একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা ঠাকুর, নেতাজী কি সত্যিই মারা গেছেন?"

ঠাকুর – কে বললো নেতাজী মারা গেছে?

ভক্ত – কিছুদিন আগে খবর বে'র হ'ল, নেতাজী প্লেন এক্সিডেন্টে মারা গেছেন। সেটা কি ঠিক?

ঠাকুর – তোর কি মনে হয়?

ভক্ত – আমার তো বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না।

ঠাকুর – আমারও তাই ধারণা নেতাজী মরে নি, এখনও সুস্থ শরীরে কাজ করে চলেছে; মনে হয়, বিরাট এক প্রোগ্রাম তার মাথায় আছে, সেটাকে সফল করার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। প্লেন এক্সিডেন্টের খবরটা হয়তো ইচ্ছাকৃত - শত্রুপক্ষের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য।

ভক্ত – যাক, তোমার মুখে শুনে নিশ্চিন্ত হলাম।

সন্ধ্যার সময়ে প্রায় রোজই বেশ ভিড় হয় - অনেক ভক্তের সমাগম হয়। ঘরে ধূপধুনা জ্বলছে - ঠাকুর আলাপ করছেন, সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছে। আগন্তুক এক ভদ্রলোক এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের ভাষণ শুনছে। ভাষণ শেষ হলে আগন্তুকটি ঠাকুরের চরণে এসে কেঁদে পড়লো, "ঠাকুর, আমি অনেক অন্যায় করেছি। না জেনে আপনার বিরূপ সমালোচনা করেছি। আমায় ক্ষমা করুন। আমি দীক্ষা নিতে চাই; যদি অনুমতি করেন আমার স্ত্রীকে নিয়ে আসি।" ঠাকুর বললেন, "বেশ তো, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এস।" আগন্তুক ভদ্রলোকটি ঢাকার একটি রেষ্টুরেন্টে বসে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খোশগল্প করতে করতে ঠাকুরের নামে প্রায়ই কটুক্তি করে – এটা প্রায় তাদের দৈনিক রুটিনের মধ্যে পড়ে গেছে। এক বন্ধু কথায় কথায় জিজ্ঞেস করে, 'সাধুটি দেখতে কেমন?' ভদ্রলোকের খেয়াল হ'ল – সত্যিই তো, বালক ঠাকুরকে তো কোনদিন দেখেনি, তাই আজ দেখতে এসেছিল। তাঁকে দেখে, তাঁর আলাপ শুনে ওর ধারণা পাল্টে গেল; দীক্ষা নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পরে সস্ত্রীক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। ঠাকুর ওদের দীক্ষা দিয়ে দিলেন। দক্ষিণাস্বরূপ ভদ্রলোক দশটাকার একটি নোট দিতে গেল। ঠাকুর নোটটি হাতে নিয়ে বললেন,

"দীক্ষা নিতে দক্ষিণা লাগে না। দিল দক্ষিণাই যথেষ্ট। তুমি বরং এক কাজ কর। এই টাকাটা দিয়ে কিছু ফলমিষ্টি কিনে তোমার বন্ধুটিকে দিয়ে এস। তাকে গিয়ে বলবে, - 'তোমার জন্যই আজ আমার জীবনের একটা আমূল পরিবর্তন হ'ল। আমি গুরুকৃপা পেয়ে ধন্য হলাম।"

বন্ধু তো তাকে দেখে অবাক, "আরে, এত ফল-মিষ্টি - কি ব্যাপার?" ভদ্রলোক তখন আদ্যোপান্ত সব কথা বললো। বন্ধুর বাড়িতে কয়েকজন আত্মীয় এসেছে। তারা সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনলো ভদ্রলোকের কথা। ঠাকুরের কথা শুনে তাদের এত ভাল লেগেছে যে, তারা তখনই ঠাকুরের কাছে যাবার জন্য তৈরী হ'ল। স্বামী-স্ত্রী আত্মীয়-স্বজন মিলে পাঁচ ছয়জন ঘোড়ার গাড়ী করে বন্ধুর সঙ্গে রওনা হ'ল ঠাকুরবাড়ির দিকে। ঠাকুরের দর্শন পেয়েই তারা অভিভূত হয়ে গেল। না দেখেই এতদিন সমালোচনা করে গেছে। আজ সাক্ষাৎ তাঁর দর্শন পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেল। ঠাকুর তাদের মনস্কামনা পূর্ণ করে দীক্ষা দিলেন। সংস্কারবশতঃ গুরুকে দক্ষিণা দিতে গেল। ঠাকুর টাকাটা ছুঁয়ে দিয়ে বললেন, "তুমি যার কাছ থেকে প্রথম আমার নিন্দা শুনেছিলে, তাকে এই টাকা দিয়ে ফল-মিষ্টি কিনে দিয়ে এস। তাকে গিয়ে বলবে যে, সে তোমার যে উপকার করেছে, তার তুলনায় এই ফলমিষ্টি অতি নগণ্য।"

এইভাবে কয়েক সপ্তাহ ধরে বেশ কিছু লোক আসতে শুরু করলো। তারা সবাই এতদিন শোনা কথায় বিশ্বাস করে বালক ঠাকুরের নামে অযথা অপবাদ দিয়ে এসেছে। এখন দীক্ষিত বন্ধুর মুখে সত্য ঘটনা শুনে মুগ্ধ হয়ে দীক্ষাগ্রহণ করে জীবন সার্থক করলো। ঢাকার সেই রেষ্টুরেন্টের আবহাওয়া এখন পাল্টে গেছে। এতদিন লোকমুখে শুনে যারা ঠাকুরের নামে কটুক্তি করে গেছে, তারাই এখন পরমভক্ত - ঠাকুর ছাড়া জানে না।

এর মধ্যে একদিন একটি লোক এসে ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলছে, "বাবা, তোমার অশেষ কৃপা।" লোকটিকে দেখে এক ভক্ত তার সঙ্গীকে বললো, "আরে! সেই লোকটা না! দাঁড়াও, বে'র হোক না, ওকে ধরছি।" ওরা তাকে-তাকে আছে কতক্ষণে লোকটি বের হয়। ঠাকুরঘর থেকে বের হতেই লোকটির কলার চেপে ধরেছে – "এখানে তো দেখছি খুব ভক্তি দেখানো হ'ল, আর রাস্তায় গিয়ে বদনাম করা হবে। দাঁড়াও, তোমাকে আজ ছাড়ছি না," বলে টেনে

রাস্তায় নিয়ে গিয়ে দু'এক ঘা বসিয়ে দিল। লোকটিকে বোধ হয় আরও কয়েক ঘা খেতে হ'ত যদি না আরেক ভক্ত এসে বাধা দিত। সব কথা শুনে ভক্তটি বললো, "তোমাদের লাগাটা স্বাভাবিক। আমিও একবার একই কারণে একজনকে মেরে বসেছিলুম। তারপর যখন সব জানতে পারলুম, আমার আফশোষ হ'ল।"

- এতে আবার আফশোষ হবার কি আছে?

- তবে বলছি শোন। সেই লোকটি, যাকে আমি মেরেছিলাম একদিন, সে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে ঠাকুরের কাছে এসেছিল। ডাক্তার তাকে জবাব দিয়েছে, চিকিৎসাশাস্ত্রে আর কিছু করার নেই। ঠাকুরের পায়ে কেঁদে পড়লো, "ঠাকুর, আমাকে ভাল করে দিন।" ঠাকুর বললেন, "বেশ তো, তোমায় একটা ব্যবস্থা দিচ্ছি। গাছ-গাছড়া দিয়ে ওষুধ করার ব্যবস্থা তো আছে। আমারও একটা ব্যবস্থা আছে। তুমি অহীন্দ্রের কাছে যাও, ওকে বলবে যে, ও যে ব্যবস্থায় ভাল হয়েছে সেই ব্যবস্থাপত্রটি দিতে। সেই ব্যবস্থা নিতে যদি তুমি ইচ্ছুক হও, তবে তোমার রোগ ঠিকই ভাল হবে। তুমি রোগমুক্ত হবে।" লোকটি রাজী হ'ল, "আজ্ঞে, ঠিক আছে, আপনার ব্যবস্থামতই কাজ ক'রব।" অহীন্দ্রের ঠিকানা নিয়ে নতুন আশায় বুক বেঁধে লোকটি তখনকার মতন চলে গেল।

অহীন্দ্রের কাছ থেকে ব্যবস্থাপত্র পেয়ে তো লোকটি মাথায় হাত দিয়ে বসলো। এ কি করে সে করবে? ব্যবস্থাপত্রে লেখা আছে - "রোগীকে তিন মাথার মোড়ে বা দু'রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে ইচ্ছামত গালিগালাজ দিতে হবে, যা মুখে আসে তাই বলতে হবে - এমনভাবে ঠাকুরের নিন্দা-অপবাদ করতে হবে যে, লোকে যেন বিশ্বাস করে। রোজ অন্ততঃ পঞ্চাশজনের কাছে অপবাদ ছড়াতে হবে।" রোগের গুরুত্ব বুঝে কারও সাতদিন, কারও দশদিন আবার কারও ষোলদিন এই গালিগালাজ হবে। এই ব্যবস্থা যে দেওয়া হয়েছে, এটা কারও কাছে বলা নিষেধ।

লোকটি ব্যবস্থাপত্র পড়ে হতভম্ব হয়ে বললো, "ঠাকুরের নামে মিথ্যা অপবাদ দেব, তাঁকে শুধু শুধু গালিগালাজ দেব – এতে তো অপরাধ হবে!"

অহীন্দ্র বললো, "আমিও তো এই ব্যবস্থা-মত কাজ করেছি, আর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি। ব্যবস্থা-মত গালিগালাজ বা অযথা অপবাদ দিলে কোন ক্ষতি হয় না। তবে এমনি যারা না জেনে-শুনে গালিগালাজ দিচ্ছে, তাদের বেলায় কিন্তু বিপরীত ফল হতে পারে, তাদের কঠিন রোগ হয়ে যেতে পারে এবং অনেকের বেলায় হয়েছেও জানি। রোগাক্রান্ত হয়ে তাদের অনেকের আবার ঠাকুরের কাছে আসতে হয়েছে।"

লোকটি বলে, "আশ্চর্য ব্যাপার তো! কেন ঠাকুর এরকম ব্যবস্থাপত্র দিলেন, বুঝতে পারছি না।"

অহীন্দ্র – কেন করলেন বলতে পারবো না। এই ব্যবস্থা যে তার রোগ সারানোর জন্য দেওয়া হয়েছে, সেটা কাউকে বলা নিষেধ। ব্যবস্থা-পত্রটা লিখে রেখে দেওয়ার নিয়ম আছে এবং তাঁর আদেশ পেলে অন্যকে লেখাটা দিতে হয়। রোগমুক্ত হয়ে গেলে তখন এই ব্যবস্থা পত্রের কথা জানালে দোষ নেই।

রোগী – রাস্তাঘাটে মার না খাই। ঠাকুরের হাজার হাজার সন্তান চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, তারা গুরুর নামে এই সব মিথ্যা অপবাদ শুনলে তো আমাকে মেরেই বসবে।

অহীন্দ্র – হ্যাঁ, তা ঠিক। আমিও দুই-এক ঘা খেয়েছি। ওটা মনে হয় ব্যবস্থারই একটি অঙ্গ। আমার কাপড় জামা ছিঁড়ে দিয়েছে। চড়-চাপড়ও খেয়েছি, কিন্তু প্রতিবাদ করিনি। রোগ তো সেরে গেছে, সুতরাং মার খেয়েছি তাতে দুঃখ নেই। পরে অবশ্য যারা মেরেছিল, সবাই ক্ষমা চেয়েছে।

রোগী – খুব সোজা ব্যবস্থা নয় - অনেক ঝঞ্ঝাট আছে এতে।

অহীন্দ্র - হ্যাঁ ঝঞ্ঝাটও আছে, আরামও আছে। বাংলাদেশের বহু জায়গায় হাজার হাজার লোক এই ব্যবস্থামত ঠাকুরের নামে অপবাদ দিয়ে বেড়াচ্ছে, যা তা গালিগালাজ দিয়ে চলেছে – আমরা শুধু মুচকি মুচকি হাসি। শুধু নজর রাখি - ব্যবস্থামত করছে, না ব্যবস্থা ছাড়াই করছে। দুই

একদিন দেখলেই বোঝা যায় কে কি করছে – তারপর যদি বুঝি ব্যবস্থা ছাড়াই ঠাকুরের বদনাম করে যাচ্ছে, তখন আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা নিই। আজে বাজে কথা বলে কেউ রেহাই পায় না। ভাব দেখলেই বুঝতে পারা যায় কোন্‌টা অসুস্থতার হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। অনেকে জিজ্ঞেস করেও বসে, 'কদিন হ'ল?' আবার এমন অনেক জায়গায় হয়েছে যে, ঠাকুরের বদনাম করতে গিয়ে জনসাধারণের হাতে এমন মার খেয়েছে যে, হাসপাতালে গিয়ে ব্যাণ্ডেজ করাতে হয়েছে। কিন্তু যতই আঘাত আসুক না কেন, ব্যবস্থামত কাজ করে গেলে আশ্চর্যভাবে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যায়। এই যক্ষ্মারোগীটিকে আমিই একদিন রাস্তায় মেরেছিলাম। পরে সব শুনে আমার আফশোষ হ'ল।

– আশ্চর্য! মানুষ চায় প্রশংসা, চায় যশ, মান, প্রতিষ্ঠা - তার জন্য আজীবন মেহনৎ করে যায়, আর ঠাকুর নিচ্ছেন একেবারে বিপরীত পথ। বুঝতে পারছি না, কেন তিনি স্বেচ্ছায় নিজের উপর অপবাদের বোঝা টেনে নিচ্ছেন।

- হ্যাঁ, আমাদেরও সেই জিজ্ঞাসা ছিল। কিছুদিন আগে এই নিয়ে ঢাকায় আমাদের একটা বিরাট আলোচনা-সভা বসেছিল। কয়েক হাজার লোক এই ব্যবস্থামত দুর্নাম রটিয়ে সুস্থ হয়েছে ঠিকই, তবু আমাদের প্রশ্ন ছিল যে, ঠাকুর এরকম একটা ব্যবস্থা নিলেন কেন? সভায় ঠিক হ'ল, ঠাকুরকে একবার জিজ্ঞাসা করে জেনে নেব।

আমাদের প্রশ্ন শুনে ঠাকুর বললেন, "দেখ, লোকের ভিড় যখন ভীষণ বেড়ে চলতে থাকে, আমার কাজের অসুবিধা হয়ে যায়। তখন যদি এই দুর্নামগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, ঝড়-ঝাপটাটা একটু কমে আসে। লোকে এই সব অপবাদের কথা শুনে দ্বন্দ্বের দোলায় দুলতে থাকে - ভীড়ের চাপটাও একটু কমে আসে। বোমা মেরে যেমন বানের গতি কমিয়ে দেয়, এটাও তেমনি বোমা মেরে গতি কমানো হ'ল। হাজার হাজার লোক আসছে, সর্বদাই একটা বিরাট চাপ – সেদিক থেকে একটু উপশম হয়।"

"তাছাড়া সত্য কখনও মিথ্যা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না। যে খেলোয়াড়, সে শূন্যে যতই পাক খাক না কেন, পড়বার সময় ঠিক সিধে হয়ে পড়ে। বাঘ বল, সিংহ বল, বিড়াল বল – শূন্যে

যত পাকই দিক না কেন, তারাও মাটিতে পড়বার সময় সোজা হয়ে পড়ে। ব্যবস্থামত এই যে অপবাদ ছড়াচ্ছে - এই মুখরোচক অপবাদ মুখে মুখে যত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যায়, খ্যাতি, প্রশংসা বা সুনাম তত তাড়াতাড়ি ছড়ায় না। বিনা পয়সার দুর্নাম যত তাড়াতাড়ি প্রচার হয়ে যায়, বহু পয়সা খরচ করেও সুনাম বা সুখ্যাতি তত তাড়াতাড়ি প্রচার করতে পারবে না। নিমেষে লক্ষ লক্ষ লোক জেনে যাবে আমার কথা – দুর্নাম হোক, জানলো তো! এমন কি সংবাদপত্রগুলিও কুৎসা হলে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নেবে, সুনাম বা সুখ্যাতি অত সহজে নেবে না। আমার অপবাদ যাদের টেনে আনবে, প্রকৃত খেলোয়াড় যদি হয়ে থাকি - আমার গুণে, আমার সত্যনিষ্ঠাই তাদের পরিবর্তন করে নেবে। যে প্রকৃতির সুর নিয়ে চলেছি, শত অপবাদের মধ্যেও দেখি, আমার ন্যায় নিষ্ঠা দিয়ে সেই সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারি কিনা। [তাই দেখছি, এত অপবাদ-অপপ্রচার সত্ত্বেও আজ তাঁর তিন কোটি সন্তান। নানাভাবেই তো তারা আসছে - অপবাদ শুনে আসছে, এসে দেখছে সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি সেদিন যা বলেছেন, আজও তাই দেখতে পাচ্ছি। ঠাকুর বলেন, "অপবাদের মাধ্যমে বহুলোককে টেনে আনছি - কোন ঠেকা পয়সা দিয়ে প্রচার করার? অপবাদের সংবাদ যত তাড়াতাড়ি ছড়ায়, প্রশংসা বা সুখ্যাতি তত তাড়াতাড়ি ছড়ায় না। অসার থেকেই আমি সারে পরিণত করি।" আজ তাই দেখতে পাচ্ছি - সুনাম, দুর্নাম দুয়েরই একই মূল্য, আমাদের কাছে কোন গুরুত্ব নেই।]

একদিন দর্শনের সময় একটি কঙ্কালসার শিশুকে নিয়ে এল এক দম্পতি। ঠাকুর দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমাদের এই একটি সন্তান, না আরও আছে? একে বাঁচাতে চাও, না জায়গামত পাঠিয়ে দেব?” দম্পতি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, “এই আমাদের প্রথম এবং একমাত্র সন্তান। এ না বাঁচলে আমাদের আর বেঁচে লাভ কি? একে দয়া করে ভাল করে দিন।” ঠাকুর বললেন, “দাঁড়াও, তোমরা কি চাও ঠিক করে বুঝে নি। ওতো আর চিরকাল বেঁচে থাকবে না। জন্ম নিলেই মরতে যে হবে সেটা তো তোমাদের জানাই আছে। তোমরা শুধু চাইছো যে, ‘এখন না মরে, তোমরা যতদিন আছো, ততদিন অন্ততঃ ও যেন থাকে – এই তো; অর্থাৎ চাইছো শ্মশানে ও যেন পঞ্চাশ-ষাট বছর পরে যায়, সেই আশীর্বাদ করুন’ - আমার রায় তো সেই ভাবেই দিতে হবে।” অতি দুঃখের মধ্যেও ঠাকুরের কথায় তারা হেসে ফেললো। [শ্রীবীরেন্দ্রবাণী]

ঠাকুর একজনকে এক গামলা গরম জল আনার নির্দেশ দিলেন। গরম জল আনা হ'ল – তখনও জল থেকে বেশ ধোঁয়া উঠছে। ঠাকুর শিশুটির মাকে আদেশ দিলেন, "এই গরম জলের মধ্যে শিশুটিকে ডুবিয়ে রাখ।" মা শিশুটিকে কোলে নিয়ে, গরম জলে একটু আঙ্গুল ডুবিয়ে দেখলো। ঠাকুর বললেন, "তুমি রাখ।" তারপর ওর বাবাকে বললেন, "ওকে গরম জলে ডুবিয়ে দাও।" ওর বাবা বললো, "গরম জলে? দেব? দেব? দেব?" – তিনবার বললো। ঠাকুর বললেন, "তুমি রাখ।" তারপর এক ভক্তকে ডেকে বললেন, "গরম জলে দিয়ে দাও।" ভক্তটি ওকে একেবারে গরম জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিল। নতুন লোকের দেখলে মনে হবে যে, ওদের প্রাণে মায়া-দয়া বলে কিছুই নেই, কিন্তু ভক্তদের মনে কোন দ্বিধা নেই, কারণ তারা ঠাকুরের অজস্র বিভূতি দেখেছে। শিশুটি জলের ভিতর বেশ খেলা করছে, এদিকে জল থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছে। শিশুর মা-বাবা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে। ঠাকুর তারপর বললেন, "ও আরও দু'বছর ভুগবে, পরে ভাল হয়ে যাবে, তার কারণ, আমার কথা বলার সাথে একজন জল পরীক্ষা করতে গেছ, আর একজন পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করে পরীক্ষা করেছ জলে না দিয়ে পারা যায় কিনা। তোমাদের আর কিছুদিন ভোগাবে, তারপর ভাল হয়ে যাবে।" ওরা আশীর্বাদ নিয়ে চলে গেল।

এরপর আর একদিন ওই 'কঙ্কাল-সার' শিশুটির বাবা-মা ঠাকুরকে দর্শন করতে এসেছে - সঙ্গে অনেক ফলফুল নিয়ে এসেছে। ঠাকুর স্পর্শ করে দিলেন এবং সবার মধ্যে বিতরণ করে দিতে বললেন।

ভক্তেরা জানতে চাইলো, কি করে ঠাকুর শিশুটিকে ঐ গরম জলে ডুবিয়ে ভাল করলেন অথচ শিশুটি গরম বোধ করলো না। শিশুর মা-বাবাকে লক্ষ্য করে ঠাকুর বললেন যে, ওরা নতুন - তাই গরম জলের মধ্যে শিশুটিকে ডোবাতে পারলো না – ওদের পক্ষে এটা স্বাভাবিক। উত্তপ্ত জায়গায় যদি শরীরেও সমান উত্তাপ থাকে তবে গরম বোধ হয় না। তার উপর হ'লে আবার শীতও বোধ হয়। চুম্বকে লোহা বা ইস্পাত ঘসলে সেই লোহা বা ইস্পাত চুম্বকে পরিণত হয়। মনঃশক্তির ইচ্ছাতে ও তার স্পর্শে আমাদের ভিতরের সহজাত উত্তাপ তেমনি অন্যের উপর চুম্বকের মত কার্যকরী হয়। ঠিক যেমন-যে কোন শক্তিমানের ইচ্ছাধীনে যে কোন সময়ে রূপ ও গুণকে পরিবর্তন

করা সম্ভব - তেমনি কি উষ্ণ, কি শীতল, যে কোন রূপ ও গুণের বেলায় একই অবস্থা। তাই হয়েছিল শিশুটির [বি. এল. রায় ও রাণী রায়ের কন্যা শুক্লা রায়, এখন শুক্লা গুহ ঠাকুরতা] বেলায়। যখন জ্বরে শরীরের উত্তাপ বেড়ে যায়, সেই অসুস্থতার ভিতর গরম দেশের চৈত্রমাসের তাপকেও ঠান্ডায় পরিণত করে ফেলে। এই অসুস্থতায় - অসুস্থতার যে শক্তিটা তোমাকে এমনি করে দখল করে ফেলেছে যে, স্বভাবজাত উত্তাপকে বৃদ্ধি করতে সেই তাপের দিকেই শক্তিটা প্রযোজ্য হয়ে যাচ্ছে। তাই যে জিনিস আছে বা রয়েছে, মনঃশক্তিতে সর্বাবস্থায় তাই বৃদ্ধি করে সেই 'আছে' শক্তির চরম বিকাশে পরিণত করতে হয় - এর বেলায় ঠিক তাই হয়েছে। সুতরাং গরম জল ওর কাছে ঠান্ডা জলে পরিণত হয়েছিল।

দীক্ষা-গ্রহণ করলেই যে গুরুর প্রতি অটল বিশ্বাস সবসময়ে আসে তা নয়, নিজের দ্বন্দ্ব-দ্বিধায় তখন ভুগতে থাকে। এই যুবক ভক্তটির মনে সেই রকম বিশ্বাসের গভীরতা ছিল না, তবুও একটা দিক তার ভাল ছিল যে, ঠাকুরের আদেশ অমান্য সে করতো না। ভাল চাকরী পেয়েছে যুবক - একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, সুতরাং মোটামুটি স্বচ্ছল অবস্থা। হঠাৎ একদিন ঠাকুরের কাছ থেকে নির্দেশ এল - "চাকরী ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে এস।" ঠাকুর তখন কলকাতায়। ঠাকুরের নির্দেশ – সুতরাং চাকরী ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে এল - মনে দ্বন্দ্ব যে, লোকে চাকরী পায় না আর আমাকে ঠাকুর চাকরী থেকে ছাড়িয়ে আনলেন! দ্বন্দ্বে বেশিদিন ভুগতে হ'ল না। একদিন সকালে উঠে খবরের কাগজে দেখলো যে, সেই ব্যাঙ্কটি [দার্জিলিং ব্যাঙ্ক] ফেল পরেছে আর ব্যাঙ্কের নতুন ম্যানেজারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে যুবক বলে, "ঠাকুর কি বাঁচান বাঁচিয়েছেন!" বেশ কয়েক মাস বেকার বসে আছে - ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। খাবার কোন ঠিক নেই, বেশির ভাগ দিনই কপালে জোটে চার পয়সার চাপাটি আর ডাল। দু'বেলা এই খেয়ে দিন কাটায়।

কিছুদিন পরে ঠাকুর জলপাইগুড়ি গেলেন [জলপাইগুড়িতে এস. কে. ঘোষের বাড়িতে ঠাকুর উঠেছিলেন] - অন্য দুই তিনটি ভক্তের সঙ্গে যুবকটিকেও নিয়ে গেলেন। শীতের দিন - আরও উত্তরবঙ্গের শীত, তার উপর সঙ্গে উপযুক্ত বিছানাপত্র নেই। কিন্তু কোন অসুবিধা হয় না। ঠাকুরের

সঙ্গে সঙ্গে থাকে, সুতরাং যুবকটির ভালই লাগে। চাকরী নেই সে কথা প্রায় ভুলেই গেছে। কথায় কথায় ঠাকুর একদিন জিজ্ঞাসা করেন, "কি খেতে ইচ্ছে করে, বল?" গুরুকে পরীক্ষা করার প্রবণতা তখনও তার সম্পূর্ণ যায় নি, যুবক বলে উঠলো, "আনারস খেতে ইচ্ছে করছে।" মুহূর্তের মধ্যে পরিপক্ক আনারস ওর হাতে দিয়ে বললেন, "সুন্দর গন্ধ, না রে!" যুবক হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "এই সময়ে পাকা আনারস কোথায় পেলে?" ঠাকুর বললেন, "ত্রিপুরার আনারস।" নিজেই আনারসটি কেটে সবাইকে প্রসাদ দিলেন। সবারই মুখে এক কথা, "এত চমৎকার, মধুর মত মিষ্টি আনারস জীবনে খাইনি!"

জলপাইগুড়ির যে বাড়িতে উঠেছিলেন, সেই বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে দূর্বোধ্য ভাষায় ঠাকুর কত কি বলেন, যুবক অবাক হয়ে শোনে। আবার কখনও কখনও তত্ত্বালাপ করেন ঘন্টার পর ঘন্টা – মুগ্ধ হয়ে সবাই শোনে।

একদিন রাত্রে ঘরের মেঝেতে বিছানা করে শুয়ে আছে যুবক, ঠাকুর খাটের উপর বিশ্রাম করছেন। হঠাৎ কি কারণে যুবকের ঘুম ভেঙে গেল – কেমন যেন একটা ভয়-ভয় করছে। তাকিয়ে দেখে, জানলা দিয়ে একটা ছায়ার মত মূর্তি বেরিয়ে গেল, ভয় হচ্ছিল, তবু গুরুদেবের কথা চিন্তা করে সে উঠে পড়লো। দরজা পরীক্ষা করে দেখে বন্ধই আছে। গুরুদেবের খাটের কাছে গিয়েই অস্ফুটস্বরে তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "গুরুদেব তো নেই! কোথায় গেলেন? সবই তো বন্ধ।" এবার সত্যিই তার ভয় করতে লাগলো, কিন্তু কি করবে? গুরুদেবের নির্দেশ ছাড়া কিছু করতে পারে না, তাই চুপ করে যুবক বিছানায় গিয়ে বসলো। দুই-তিন ঘন্টা কেটে গেছে। যুবক একভাবেই বসে আছে। হঠাৎ ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দে যুবক ফিরে তাকালো – দেখে ঠাকুর খাটের উপর বসে আছেন। ওকে তাকাতে দেখে ঠাকুর বললেন, "জামাকাপড়গুলো একেবারে ভিজে গেছে, ছাড়িয়ে দে তো।" যুবক তাড়াতাড়ি জামাকাপড় ছাড়িয়ে, গা হাত পা মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করলো, "একেবারে ভিজে গিয়েছ যে! এভাবে ভিজলে কি করে?" ঠাকুর বললেন, "ভীষণ বরফ পড়ছে, তাই ভিজে গেছি।"

"বরফ পড়ছে? কোথায়?" যুবক অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে। "তিব্বতে গিয়েছিলুম কিনা, তাই ভিজে গেছি", ঠাকুর বলেন, "এক ভক্ত স্মরণ করছিল, না গিয়ে পারলুম না।" .....

কলকাতায় ফিরে এসেছেন ঠাকুর। এদিকে যুবকটির সংসারের অবস্থা খুবই খারাপ। ঢাকাতে তার স্ত্রী কন্যাসন্তানটিকে নিয়ে বেশ কষ্টে কাটাচ্ছে। একদিন ঠাকুরকে জানালো যুবক, "এ ভাবে তো আর চলছে না, ঠাকুর। একটা চাকরী তো করা দরকার।" ঠাকুর বললেন, "ঠিক আছে চেষ্টা কর, পেয়ে যাবি।" অফিস-পাড়ায় এক পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা, সে অবাক হয়ে বলে, "তোমার চেহারাটা তো বেশ খুলেছে! খুব দুধ-ঘি খাচ্ছো বুঝি?" যুবক মুচকি হাসে কিন্তু কিছু বলে না, ভাবে, 'আসল কথাটা তো আর বলা যাবে না। চার-পয়সা চার-পয়সা দু'-আনার দোকানের ডালরুটি খেয়ে কার স্বাস্থ্য কবে ভাল হয়েছে? ঠাকুরের কাছে আছি, তাই এই খাবারই দুধ-ঘিয়ের কাজ করছে।'..... যাই হোক, কয়েকদিনের মধ্যেই একটা মোটামুটি ভাল চাকরী পেয়ে গেল যুবক। কয়েকমাস বেশ সচ্ছন্দে কাটালো, তারপর একদিন আবার ঠাকুর তাকে চাকরী ছেড়ে দিতে বললেন। চাকরী ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরের কাছে আছে। ক্রমে হাতের ক'টা টাকায় টান পড়তে শুরু করলো। ঠাকুরকে নিজের অবস্থা জানাতে বাধ্য হ'ল। ঠাকুর বললেন, "ঠিক আছে, ভাবিস না। চাকরী পেয়ে যাবি।" কয়েকদিনের মধ্যেই একটা ভাল কোম্পানী [ওয়ার্ডেন ইনসিওরেন্স কোম্পানী] থেকে ডাক এল। ভাল চাকরী, মাইনেও ভাল, একটা গাড়ী দেবে। যুবক ভাবলো - এবার তাহলে অভাব ঘুচবে। চাকরীতে যোগ দিয়েছে দিনরাত পরিশ্রম করে, কোম্পানীর উপরওয়ালারা যুবকের উপর খুব সন্তুষ্ট। কোম্পানীতে যুবক বেশ নাম করেছে, কিছুদিন যায়, হঠাৎ একদিন ঠাকুর ডেকে পাঠালেন যুবককে। যুবক দেখা করতেই ঠাকুর বললেন, "চাকরীটা ছেড়ে দে।" যুবক আপত্তি জানায়। এত ভাল চাকরী, গাড়ী দিয়েছে, ভাল মাইনে দিচ্ছে – এটা ছেড়ে দেবে? তা ছাড়া চাকরী ছাড়তে হলে বোম্বাইয়ের কোম্পানী কর্তাদের সব বুঝিয়ে দিতে হবে, তাতে সময় লাগবে। ঠাকুর বললেন, "ঠিক আছে, সাতদিন সময় দিলাম। চাকরী ছেড়ে চলে এস।" কোম্পানীর এক বড়কর্তা এসেছে, থাকতে বলছে কোম্পানীতে - কিন্তু যুবক নির্দেশ অমান্য করতে পারে না। চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে এসে ঠাকুরের কাছে উঠলো। কিছুদিন পরে শুনলো ওই কোম্পানীর কেশিয়ার আর

অফিসারের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে। ঠাকুরকে খবরটি জানাতেই তিনি বললেন, "তুমি থাকলে তোমাকেও জেলে যেতে হ'ত।" পরে খবর পাওয়া গেল যে, কেশিয়ার ছাব্বিশ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছে। এই টাকা তছরুপ করবার ফন্দী সে বেশ কিছুদিন ধরে এঁটেছিল, কিন্তু যুবকটি হঠাৎ চাকরীতে ইস্তফা দেওয়াতে অসুবিধায় পড়ে গিয়েছিল। নতুন অফিসার আসার পরে কেশিয়ার টাকাটা নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছে আর অফিসারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যুবক [বি. এল. রায়] এসে ঠাকুরের পায়ে কেঁদে পড়লো, "ঠাকুর, তোমার অশেষ কৃপা, তুমি আমাকে বড় বাঁচান বাঁচিয়েছ।" .....

ঢাকা শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কখন যে লাগবে কেউ বলতে পারে না। সব শান্ত, কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ হয়তো একটা বচসার সূত্র ধরে ছুরি-ছোরা চলতে লাগলো। নিরীহ জনসাধারণ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটতে লাগলো বা অতর্কিতে ছোরার আঘাতে প্রাণ হারালো। এমনি একটি ঘটনাতে কি করে আশ্চর্যভাবে একজনের প্রাণরক্ষা হয়েছিল, তার বিবরণ শুনে অনেকেই সেদিন অভিভূত হয়েছিলেন। টিফিনের সময় অফিসের সব কর্মচারী টিফিন খেতে রাস্তায় বেরিয়েছে। কেউ খাবার হাতে নিয়ে খাচ্ছে, কেউ গল্প করছে; এমন সময়ে দূরে হঠাৎ একটা গণ্ডগোলের আওয়াজ পাওয়া গেল। লোকজন নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটাছুটি করছে। শোনা গেল দাঙ্গা বেধেছে। ঠাকুরের সেই ভক্তটি তখন সবে টিফিন খেয়ে ফিরছে। অফিসের কাছে এসে দেখে কোলাপসিবল গেট আটকে দিয়েছে। দাঙ্গার কথা শুনলেই অফিসের গেট সব বন্ধ করে দেওয়াই ছিল রীতি। এদিকে ভক্তটি দেখছে মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে দাঙ্গাকারীরা এগিয়ে আসছে, পালাবার পথ নেই। পাশের একটা বাড়ির দেওয়ালের কাছে এসে ভক্তটি দেখলো যে, বাঁচবার আর উপায় নেই - একমনে ঠাকুরকে ডাকতে লাগলো। হঠাৎ ভক্তটি শুনতে পে'ল ঠাকুরের কণ্ঠস্বর – বজ্র-গম্ভীর কণ্ঠে নির্দেশ দিচ্ছেন, "পাশের গলিতে দরজাটা দিয়ে ঢুকে পড়।" বাড়ির কোণাটা ঘুরতেই একটা দরজা দেখতে পেল - দরজা দিয়ে ভক্তটি সোজা ঢুকে পড়লো। - সামনেই একটা সিঁড়ি, কিন্তু বাড়িটিতে কাউকে দেখতে পেল না। সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেল। এই বাড়িটা অফিসবাড়ির সংলগ্ন, তবে অফিসবাড়ির ছাদটা প্রায় পাঁচ-ছয় হাত নিচু। কোন চিন্তা ভাবনা না করে ভক্তটি অফিসবাড়ির

[ওরিয়েন্টাল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর অফিস, ঢাকা] ছাদে লাফিয়ে পড়লো, কিন্তু আর উঠতে পারে না। সহকর্মীরা ধরাধরি করে নীচে নিয়ে গেল। ঠাকুর সেইদিনই ভক্তদের বললেন, "তোরা যদি একটু বুঝে-সুঝে চলিস, তবে আমাকে এতটা মেহনৎ করতে হয় না।" একটু পরেই খবর এল, ইন্দ্র সেনের পায়ে চোট লেগেছে, হাঁটতে পারছে না। ঠাকুর শুনে বললেন, "ঝোঁকের মাথায় লাফটা না দিলেই পারতো – ওই দরজাটা কেউ খুঁজে পেত না।"

মামাবাড়ি দোগাছিতে গেছেন ঠাকুর, ভক্তদের সমাগম হচ্ছে। যে যে ভাবে চায় সেই ভাবেই পায় ঠাকুরকে। অনেকে কীর্তন করে আসে ঠাকুরকে বন্দনা করতে। ঠাকুর তাদের বলেন, "তোমরা অষ্টপ্রহর কীর্তন করার ব্যবস্থা কর।" অষ্টপ্রহর কীর্তন করতে খরচ আছে - লোকজন খাওয়াতে হয়, আলোর ব্যবস্থা করতে হয়, বসার ব্যবস্থা করতে হয় – ওদের কি সে সামর্থ্য আছে? ঠাকুর বললেন, "যেভাবে পার ব্যবস্থা কর।" ওদের কীর্তন করার খুবই আগ্রহ, শুধু ভয় পাচ্ছিল খরচের জন্য। এখন ঠাকুরের নির্দেশ পেয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠলো। কিন্তু পদে পদে বাধা আসতে লাগলো। কয়েকদিন পরে ঠাকুর বললেন, "আমি একটু বাধা দেখছি, কীর্তনটা না হয় এখন থাক।" শচীন দাস বলে উঠল, "না ঠাকুর, আপনি যখন একটা বাক্য বার করেছেন, তখন যত বাধাই আসুক, আশীর্বাদ করুন যেন আপনার বাক্য লঙ্ঘন করতে না হয়।" ঠাকুর ওদের উৎসাহ দেখে নিজেই 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' এর এক নতুন সুর দিলেন। ওরা সবাই উঠে পড়ে লেগেছে অর্থ সংগ্রহ করতে। বাধা এল নিজেরই আত্মীয়ের বাড়ি থেকে - শচীন দাসের বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয় হঠাৎ বলে বসলো, "কীর্তনটা যদি ঠাকুরের মামাবাড়িতে না করে মাঠে কর, তবে সবাই আমরা চাঁদা দেব। না হলে সবাইকে আমরা নিষেধ করে দেব।"

শচীন দাস জবাব দিল, "আপনি বারণ করে দিন কিন্তু অষ্টপ্রহর কীর্তন বন্ধ হবে না।" লৌহজং গ্রামে ক্ষেত্র পোদ্দারের টিমে শচীন দাস একজন নামকরা প্লেয়ার – দক্ষ খেলোয়াড় হিসাবে সবাই তাকে ভালবাসে। ক্ষেত্র পোদ্দারকে সব কথা জানানো হ'ল। তিনি শচীন দাসকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "আপনি খেলুন। কীর্তনের জন্য যত টাকা লাগে, আমি ব্যবস্থা করে দেব।"

সেইমত সব ব্যবস্থা চলতে লাগলো - অন্যান্য গ্রামে কীর্তন করে করে চাঁদা তোলা শুরু করলো। অষ্টপ্রহর কীর্তনের অধিবাসের দিন ঠাকুর শচীনকে বললেন, "তুমি গ্রামে গিয়ে আত্মীয়দের নেমন্তন্ন করে এস – বলো গিয়ে যে, তাঁরা চাঁদা দিন বা না দিন কীর্তনে যেন যোগ দেন।" শচীন বলে, "বাবা, আমার আর আত্মীয়দের কাছে যেতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু আপনি যখন বলছেন, আমাকে যেতে হবে।"

এদিকে অনেক দূর দূর স্থান থেকেও কীর্তনের জন্য চাঁদা আসতে শুরু করলো। ঠাকুর বললেন, "শতরঞ্চির নীচে বেশ করে খড় বিছিয়ে দিবি।" শচীনের আত্মীয়রা এসেছে এবং আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এসেছে । বিভিন্ন জায়গা থেকে কীর্তনের বড় বড় দল আনা হয়েছে। কীর্তন শুরু হ'ল - কীর্তন শুনে সবাই অভিভূত হয়ে গেল – এ রকম প্রাণ-ঢালা কীর্তন নাকি কেউ কোনদিন শোনে নি। পরের দিন কীর্তনীয়াদের যখন টাকা দিতে গেল, তারা আপত্তি জানালো, "কার কাছ থেকে আমরা টাকা নেব? স্বয়ং মহাপ্রভু যেখানে বসে আছেন, সেখানে টাকা নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।" সবাইকে ভাল করে খাওয়ানো হ'ল। খাওয়ানো প্রায় শেষ হয়ে আসছে, এমন সময়ে বিরাট ঝড় উঠলো। ঠাকুর তখনই শচীন দাসকে ডেকে বললেন, "দেখ শচীন, তুই খোল নিয়ে কীর্তন কর, তাহলেই ঝড় বন্ধ হয়ে যাবে।" শচীন দাস সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন শুরু করে দিল, ঝড়ও আচমকা কমে গেল। সবাই ঠাকুরের পাদপদ্মে লুটিয়ে পড়লো, "মহাপ্রভু স্বয়ং না হলে কি ঝড় এভাবে বন্ধ করতে পারেন!"

এই অষ্টপ্রহর কীর্তনের তিন-চার দিন পরে, ঠাকুর একদিন বললেন, "শচীন, পাটি আর বালিশ নিয়ে আমার কাছে বস। তুই অনেক পরিশ্রম করেছিস। তুই যা চাইবি তাই পাবি।"

শচীন – আমি কি চাইবো আপনার কাছে ?

ঠাকুর – না, তুই বল, টাকা-পয়সা, দালান-কোঠা যা চাস তাই তুই পাবি।

শচীন – না বাবা, আমি কিছু চাই না। আমি যেন তোমার চরণে থাকতে পারি!

ঠাকুর বললেন, "ঠিক আছে, তুই যখনই আমাকে স্মরণ করবি, আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমাকে সশরীরে তখনই পাবি।"

বলতে বলতে ঠাকুরের ভাব অন্যরকম হয়ে গেল। ঠাকুরের চোখে জল এসে গেল, শচীনও কাঁদতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বললেন, "কাল থেকে দোকানে [দোগাছি বাজারে শচীন দাসের দোকান - ঠাকুরের মামাবাড়ি থেকে প্রায় পৌনে এক মাইল দূরে।] গিয়ে কাজকর্ম কর।"

ভাগ্যকুলের এক যক্ষ্মা রোগীকে ঠাকুর বেতের ডগা খাইয়ে ভাল করেছিলেন। এই লোকটি আর শচীন দাস রাত্রে দোকানে একসঙ্গে শোয়। সেদিন রাত্রে শচীন শুয়ে শুয়ে জপ করছে। খুব মশা, মশার কামড়ে অস্থির করে তুলছে, এমন সময় হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু কিছুতে সে চোখ মেলতে পারছিল না, কিছুক্ষণ পরে সে ঘুমিয়ে পড়লো। ভোরে উঠে আবার জপ করছে। জপ সেরে প্রণাম করতে গিয়ে দেখে তার বুড়ো হাতের আঙ্গুলে একটি আংটি। আরে, এ যে ঠাকুরের আংটি, যেটা তাঁর দাদু তাঁকে দিয়েছিলেন! কি করে তার হাতে এল! অবাক হয়ে শচীন চারিদিকে তাকায়। ঘরের দরজা জানলা সবই তো বন্ধ, তবে আংটি তার হাতে এল কি করে?

সকালেই শচীনের কুকুটিয়া গ্রামে যাবার কথা, কিন্তু হাতের আংটির দিকে নজর পড়ায় আর তার যাওয়া হ'ল না। ভোরবেলাতেই ঠাকুরের মামাবাড়িতে গেল। সেখানে ঠাকুরের এক মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। ঠাকুরের আংটিটা দেখিয়ে সে তার বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, "বুঝতে পারছি না কি করে এই আংটি আমার হাতে এল!" শচীন দেখলো যে, কেউ বিশেষ তার কথা বিশ্বাস করছে না। সে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লো। ঠাকুর তখনও দোতলার ঘরে। তাঁর কাছে আংটির খবর পৌঁছতেই তিনি বললেন, "সবাই ভাবছে শচীন আমার হাত থেকে আংটিটা নিয়েছে, কিন্তু তা নয়। ওকে রাত্রে মশায় কামড়াচ্ছিল, আমি গিয়ে মশাগুলো তাড়িয়ে দিয়ে এলাম আর আমি যে গিয়েছিলাম, তার নিদর্শনস্বরূপ আংটিটা ওর আঙ্গুলে পরিয়ে দিয়ে এলাম।"

ঠাকুরের শ্রীচরণ ধরে শচীন বলে, "তোমার কি অপার করুণা"! – অজস্র ধারায় বেয়ে পড়ে অশ্রু। ভক্তের জন্য ঠাকুরের কী দরদ! তাই তো মানুষ পাগল হয়ে ছুটে আসে তাঁর কাছে, আর তিনি অন্তরঢালা প্রেম-ভালবাসা দিয়ে তাদের বুকে টেনে নেন। দরজা জানালা বন্ধ থাকলে কি হবে? অণিমা-শক্তি সম্পন্ন মহানের গতি সর্বত্র। অণু আকারে সর্বত্রই তিনি যেতে পারেন – সেখানে দেহধারণ করে, মনুষ্যোচিত সব কাজ সম্পন্ন করে আবার অণু আকারে ফিরে আসতে পারেন।

যুবকের [বি. এল. রায়] চাকুরীস্থল নারায়ণগঞ্জ। অফিসের পর সে রোজই ঠাকুরবাড়িতে চলে আসে এবং শেষ ট্রেনে নারায়ণগঞ্জ ফিরে যায়। এটা তার প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক রুটিনে পরিণত হয়েছিল। সেদিন যুবকের মন খুব ভারাক্রান্ত – কলকাতার বরানগরে তার দিদি থাকেন, তিনি চিঠি লিখেছেন যে, তার একমাত্র ভাগ্নেকে যদি দেখবার ইচ্ছা হয় তবে যেন যতশীঘ্র সম্ভব কলকাতায় চলে আসে। তার ভাগ্নের অবস্থা খুবই খারাপ, বাঁচবার আশা কম, ডাক্তাররা কোনও ভরসা দিতে পারছে না। যুবক যখন ঠাকুরবাড়ি এসে পৌঁছাল, সে খুব চিন্তান্বিত। তাকে চিন্তান্বিত দেখে ঠাকুর বললেন, "তোর ভাগ্নের কথা চিন্তা করছিস? দিদির চিঠি পেয়েছিস বুঝি? ঠিক আছে, আমাকে একটু দেখতে দে, কাল তোকে বলব, কতটা কি করতে পারি।" রাত্রে নারায়ণগঞ্জে ফিরবার পথে যুবকের হুঁশ হ'ল, অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো, ঠাকুর কি করে দিদির চিঠির কথা, ভাগ্নের অসুস্থতার কথা জানলেন? কিন্তু তার মন এত ভারাক্রান্ত যে, এ বিষয়ে আর বেশি চিন্তা করতে পারে না। পরদিন যখন এসেছে, ঠাকুর যুবকটিকে দেখেই বললেন, "যা, তোর ভাগ্নেকে বাঁচিয়ে দিলাম। কাল রাত এগারোটা পঞ্চান্ন মিনিটে ওর অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল, অনেক মেহনত করে ওকে বাঁচিয়েছি। চিন্তা করিস না।" পরদিনই দিদির কাছে চিঠি লিখে যুবকটি জানতে চাইল – ভাগ্নে কেমন আছে? আর ঐদিন এগারোটা পঞ্চান্ন মিনিটে তার কি হয়েছিল? এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের কথাও একটু লিখলো। দিদি তো চিঠি পেয়ে আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল – ঐদিন রাত্রে এগারোটা পঞ্চান্ন মিনিটে তার ছেলের নাড়ী ছেড়ে গিয়েছিল এবং সবাই কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু তারপর আশ্চর্যভাবে জ্ঞান ফিরে আসে। এখন সে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। তারপর ঠাকুরের কথা লিখেছেন। যে আশ্চর্য মহাপুরুষ এরকমভাবে বলতে পারেন এবং মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচিয়ে তুলতে পারেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ

করার জন্য দিদি প্রার্থনা জানিয়েছেন। কিছুদিন পরেই ঠাকুর কলকাতায় গেলেন এবং যুবকটির দিদি তাঁর পরিবারের সকলের সঙ্গে ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়ে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

ঠাকুর দুই-একদিনের জন্য ঢাকাতেই এক ভক্তের [বারীন্দ্রকুমার ঘোষ] বাড়িতে আছেন। ভক্তটির মামা অন্য এক গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। ঠাকুরের অলৌকিক শক্তির কথা তিনি অনেক শুনেছেন, তাই তাঁর একান্ত ইচ্ছা কিছু দেখবার। ঠাকুরকে তিনি তাঁর আকাঙ্খা জানালেন - তিনি তাঁর ইষ্টদেবতাকে দেখতে চান। ঠাকুর বললেন, "ঠিক আছে, আপনার যখন ইচ্ছা হয়েছে, তখন দেখতে পাবেন।" যে বাড়িতে তিনি আছেন, সেই ভক্তের বাড়িতে ভিতরের দিকে একটি লম্বা বারান্দা আছে। সেই বারান্দার সংলগ্ন একটি ঘরে ঠাকুরের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বারান্দার একদিকে একটি গাছ। রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। ঠাকুর তখন ঘরে নিদ্রা যাচ্ছেন। ভক্তটির মামা যেন কিছুতেই ঘুমোতে পারছেন না - ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি গাছটির কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। কিছুক্ষণ পরে মুখ ফেরাতেই দেখেন বারান্দার আরেক কোণে দাঁড়িয়ে আছেন মা কালী স্বয়ং! স্বপ্ন দেখছেন , না সত্যি সত্যি দেখছেন, পরীক্ষা করার জন্য চোখে হাত দিয়ে, নিজেকে চিমটি কেটে দেখলেন যে, তিনি জেগেই আছেন। এতক্ষণ মা কালী দাঁড়িয়ে ছিলেন - এবার বারান্দা দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। তাঁর ত্রিনেত্র দিয়ে একটা অদ্ভুত জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ভক্তটির মামা নিজেকে বারবার পরীক্ষা করছেন - এটা তাঁর জাগ্রত না ঘুমন্ত অবস্থা! নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে যখন তিনি বুঝলেন যে, সম্পূর্ণ সজাগ, তখন আর তিনি নিজেকে সামলাতে পারলেন না, 'ঠাকুর' বলে কান্নায় ফেটে পড়লেন। মা কালীও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হলেন। মামা ঠাকুরের ঘরের কাছে গিয়ে আছড়ে পড়লেন। তাঁর কান্না শুনে সবাই জেগে গেছে। ঠাকুরের ঘরের দরজাও খোলা হয়েছে। মামা ঘরে ঢুকে ঠাকুরের চরণ ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে বল।" উত্তর নেই – হাউ হাউ করে কাঁদছেন মামা। বাড়ির সকলেই মামাকে জিজ্ঞেস করছে, কিন্তু মামা কান্না থামিয়ে যে কথা বলবেন, তা আর পারছেন না। সবাই শশব্যস্ত হয়ে উঠেছে - মামার কান্নায় নিশ্চয়ই ঠাকুরের বিশ্রামের ব্যাঘাত হচ্ছে! বেশ কিছুক্ষণ পরে মামা একটু শান্ত হলেন, আর শুধু বলছেন, "আহা কি দেখলাম, ঠাকুর কি দেখালেন!" সবাই মামার কথা শোনার জন্য উদগ্রীব। মামা

এবার একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে সব বলতে শুরু করলেন - ঠাকুরের কাছে কি তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, ঠাকুর কেমনভাবে তাঁর ইচ্ছাপূরণ করেছেন, কিভাবে মা কালী জীবন্ত হয়ে বারান্দায় হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন, ত্রিনেত্র দিয়ে তাঁর কি অদ্ভুত জ্যোতি বের হচ্ছিল, 'ঠাকুর' বলে চেঁচিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কি ভাবে তিনি অন্তর্হিত হলেন। শুনে সবাই তো অবাক। ঠাকুর তাঁর কপাল স্পর্শ করে বললেন, "ঠিক আছে, হয়েছে তো, এবার শুয়ে থাকগে যাও।"

কলকাতায় কয়েকদিনের জন্য এসেছেন, থাকবেনও কিছুদিন। এক নব দীক্ষিত ভক্ত রোজই আসে। অফিস থেকে কতক্ষণে বেরিয়ে সে ঠাকুরের কাছে যাবে সেই দিকেই তার চিন্তা। ঠাকুরের নির্দেশমত সে অহরহ জপ করে চলেছে। একদিন তার মনে হ'ল যে, মন্ত্রের উচ্চারণটা তার ভুল হচ্ছে - দুশ্চিন্তায় মন ভেঙ্গে পড়লো। সেদিন প্রণাম করতেই ঠাকুর বললেন, "তোমার কাজ খুব ভাল হচ্ছে, তোমার নিষ্ঠা দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, হাঁটায়-চলায় তুমি জপ করে চলেছো। তোমার মন্ত্রটা একটু ভুল হচ্ছে - তুমি 'এই' বলছো তো, ওটা ঠিক নয়, 'এই বলবে'। এনিয়ে কোন দুশ্চিন্তা করবে না।"

ভক্তটি [বিশ্বপদ দাসগুপ্ত - তাঁর রচিত 'প্রত্যক্ষ অনুভূতির' পাণ্ডুলিপি থেকে] আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "ঠাকুর, তুমি আমার জপ শুনতে পাও কি?" ঠাকুর হেসে বললেন, "তুমি কতবার মনে মনে জপ ক'রছ, আমার গুণতির মধ্যে আছে। তুমি এ জীবনে কতবার জপ করবে, তাও আমার হিসাবের খাতায় থাকবে। শুধু তুমি কেন, আমার সব শিষ্যের জপ সংখ্যা আমার হিসাবের খাতায় আছে।" ভয়ে-বিস্ময়ে, ভক্তিতে বিহ্বল হয়ে পড়লো ভক্ত।

আরেকদিন ভক্তটি অফিস থেকে সোজা ঠাকুরের কাছে গেছে। ঠাকুর নানা বিষয়ে আলাপ করছিলেন। আলাপ শুনতে শুনতে বেশ রাত হয়ে গেল। রাত প্রায় দশটা - ঠাকুরকে প্রণাম করে যখন বিদায় নিচ্ছে, ঠাকুর হঠাৎ বললেন, 'একটু সাবধানে যাস।' চিৎপুরের ট্রামে উঠে যাচ্ছে – নাখোদা মসজিদের কাছে এসে ট্রাম থেমে গেল। এক বিরাট মুসলমান জনতা এসে ট্রামের পথ অবরোধ করেছে, কয়েকটি মুসলমান যুবক এসে বললো, 'মুসলমান ভাইরা সব নেমে পড়ুন।' দেখে বোঝা গেল – অবস্থা ভাল নয়, অবশিষ্ট হিন্দু যাত্রীর উপর এবার আক্রমণ চলবে। ভক্তটি একমনে

মন্ত্র জপ করে চলেছে আর ঠাকুরকে স্মরণ করছে। 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি দিয়ে মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে একদল এগিয়ে আসছে। এমন সময় ট্রামের জানালা দিয়ে একটি লোক বলছে, 'বাবু, আপনি এদিক দিয়ে এলেন কেন?' ভক্তটি তাকিয়ে দেখে, তারই অফিসের এক মুসলমান কর্মচারী। বলার কিছু নেই, ভক্তটি একমনে ঠাকুরকে স্মরণ করে চলেছে আর দেখছে ওরা কি করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রামের অবরোধ সরিয়ে নিল। মুসলমান কর্মচারীটি এসে বললো, 'শিগগির চলে যান, এ পথে আর যাতায়াত করবেন না।' ট্রামের যাত্রীরা সবাই বুঝলো, মুসলমান কর্মচারীটিই ওদের সে যাত্রা বাঁচিয়ে দিয়েছে আর 'ভক্ত' ভদ্রলোকটি না থাকলে প্রাণ নিয়ে ফেরার কোন আশা থাকতো না। ভক্তটি বুঝলো যে, একমাত্র ঠাকুরের কৃপায়ই তারা বেঁচেছে - মুসলমান কর্মচারীটি নাও থাকতে পারতো।

নোয়াখালিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী অল্পদিন হ'ল বেরিয়েছে কাগজে। কিছুদিন পরে ফিসারী ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর রহমান যুবকটিকে ডেকে বললেন, "আপনাকে নোয়াখালি যেতে হবে হিন্দু জেলেদের পুনর্বাসনের জন্য।" যুবক উপায় না দেখে চাকরীতে ইস্তফা দেবার চিন্তা করছে। বাড়িতে ভীষণ আপত্তি, কেউ চায় না যে, সে নোয়াখালি যায়। পরের দিনই ঠাকুরকে গিয়ে সব জানালো। ঠাকুর বললেন, "তুই আমার সন্তান হয়ে নোয়াখালিতে যেতে ভয় পাস! আর্তের সেবা করার যে অপূর্ব সুযোগ পাচ্ছিস তা ছাড়বি কেন? তোকে তোর ডিরেক্টার ভালবাসে। তোর যোগ্যতা আছে বলেই তোকে পাঠাতে চাইছে। যা, আমি তো আছি। আমার এই ফটোটা বুকপকেটে রেখে দিবি। কখনও বিপদ হলে ফটোটা চেপে ধরবি – সব বিপদ তোর কেটে যাবে।"

পরের দিন অফিসে গিয়ে নোয়াখালি যাবার সিদ্ধান্ত জানাতেই ডাইরেক্টর রহমান তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "আপনার যোগ্যতার জন্যই আপনাকে পাঠাচ্ছি। মুসলমান অফিসারদের পাঠালে কাজ হবে না।" যুবকটি নোয়াখালি রওনা হয়ে গেল। অনেক হিন্দু পরিবারের গ্রামে গ্রামে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে বেশ নাম করে ফেললো, তার পরিসংখ্যান রিপোর্ট পেয়ে রিলিফ কমিশনার

লার্কিন ভীষণ খুশি। ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালি গেছেন সাম্প্রদায়িক প্রীতি ফিরিয়ে আনতে। মহাত্মা গান্ধী যুবকের রিপোর্ট পেয়ে তাকে ডেকে পাঠালেন।

যুবক তখন যেখানে ছিল সেই লাউতলি গ্রাম থেকে নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জ যাওয়ার রাস্তা দুর্গম, বিপদসংকুল, কোন যানবাহন নেই - সমস্ত রাস্তা পায়ে হেঁটে যেতে হবে। সঙ্গে যাবার কেউ নেই, সারা পথ একাই যেতে হবে। এদিকের গ্রামের সীমানা পর্যন্ত একটি লোক পৌঁছে দিল। তারপর যুবক একাই চলতে শুরু করলো - দুধারে বীভৎস অত্যাচারের দৃশ্য, গ্রামের পর গ্রাম বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। একটু এগোতেই বাঁশীর শব্দ শোনা গেল। সামনেই জঙ্গল, জঙ্গলের ভিতর ঢুকতেই কয়েকজন মুসলমান যুবককে দেখা গেল, তারা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। বিপদের আশঙ্কা দেখে যুবক বুকপকেটের ফটো চেপে ধরেছে আর মনে মনে ঠাকুরকে ডাকছে। হঠাৎ চমকে উঠে দেখে এক বলিষ্ঠ দাড়িওয়ালা মুসলমান ফকির এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। কোথা থেকে কি ভাবে এল যুবক বুঝতে পারে না। ফকির বললো, "বাঁচতে যদি চা'ন, আমার পিছনে আসুন। বাঁশী বাজছে আপনাকে শেষ করবার জন্য।" ফকিরকে বিশ্বাস করা উচিত কিনা যুবক বুঝতে পারে না, তবু তাকে বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় নেই দেখে ফকিরের পিছনে পিছনে চলতে লাগলো। সামনে সুপারী বাগান - সুপারী বাগানে ঢুকে বাঁশীর শব্দ আর বিশেষ শুনতে পাচ্ছে না। বুকে হাত দিয়ে চলছে দেখে ফকির জিজ্ঞাসা করে, "বুকে হাত দিয়ে চলছেন কেন?" যুবক উত্তর দেয়, "বুকে একটা ব্যথা বোধ করছি তাই।" শুনে কি ভেবে ফকির যেন একটু হাসলো। আরও প্রায় আধঘন্টা হাঁটার পর দূরে একটি ত্রাণশিবিরের আলো দেখা গেল। সেখানেই সুপারীর বাগানটি শেষ হয়ে গেছে। ফকির কাছে এসে বললো, "এবার আপনি বিপদমুক্ত। দূরে যে আলো দেখা যাচ্ছে সেখানে চলে যান। ওদের সাহায্যে গন্তব্যস্থলে চলে যেতে পারবেন।" যুবক বললো, "আপনাকে আমি জীবনে ভুলতে পারবো না, আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করলেন।" ফকির জবাব দিলেন, "আপনাকে রক্ষা করে আমিও অনেক পুণ্য সঞ্চয় করলাম। আল্লা যেন আপনাকে দোয়া (আশীর্বাদ) করেন।" চলতে চলতে সে পিছন ফিরে ফকিরকে দেখতে লাগলো - তখনও ফকির দাঁড়িয়ে। কিছুদূর এগিয়ে আবার পিছন

ফিরে তাকালো - এবার দেখে ফকিরের জায়গায় দাঁড়িয়ে শুভ্র বেশধারী ঠাকুর, তাঁর একটি হাত আশীর্বাদের ভঙ্গীতে তোলা। মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে চললো যুবক।

কাজ শেষ করে সুনাম নিয়ে ফিরে এসেছে যুবক। ঠাকুর বললেন, "আমার আদেশে ওই কাজে গিয়েছিলি - প্রশংসা হবে না!" যুবক কয়েকটি প্রশ্ন করতে চায়, ঠাকুর বলেন, "যা করেছ, যা জেনেছ, যা উপলব্ধি করেছ ওই সময়ে - সব সত্যি। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবে না।"

রোজই অফিস ফেরৎ ঠাকুরের কাছে যায় যুবক। একদিন প্রণাম করে উঠতেই ঠাকুর বললেন, "আমি শীঘ্রই ঢাকা যাচ্ছি।" যুবক ভেঙ্গে পড়লো - ঠাকুর বললেন, "ভাবিস না, তোকেও নিয়ে যাব।"

১৯৪৬ সালের শেষের দিকে ঠাকুর ঢাকায় চলে গেলেন। যুবকের আর দিন কাটতে চায় না। একদিন নৌকা করে গঙ্গা পার হচ্ছে, মনে দারুণ ব্যথা – ঠাকুরের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে কতদিন তাকে থাকতে হবে জানে না - অদূর ভবিষ্যতে ঢাকা যাবার কোন সম্ভাবনা খুঁজে পাচ্ছে না। বুক ফেটে তার কান্না আসছে - অঝোরে অশ্রু ঝরছে তার দুই গণ্ড বেয়ে।

১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকেই ডাইরেক্টর সাহেব যুবককে ডেকে পাঠালেন। ভয়ে ভয়ে সে দেখা করতে গেল – হয়তো আবার কোথাও বিপদসঙ্কুল জায়গায় পাঠাবে। ডিরেকটর বললেন, "আমি একজন যোগ্য ব্যক্তিকে ঢাকায় পাঠাতে চাচ্ছি – দয়া করে আপত্তি করবেন না।" ঠাকুরের কাছে যেতে পারবে – মন তার আনন্দ ও বিস্ময়ে ভরে ওঠে। মনের ভাব চেপে রেখে বলে, "ঠিক আছে আমি যাব।" ঢাকার অবস্থা তখন চরমে উঠেছে – হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা লেগেই আছে - প্রায়ই কারফিউ ঘোষণা করে। হিন্দুরা মুসলমান এলাকায় যেতে পারেনা, মুসলমানরা হিন্দু এলাকায় যেতে পারে না। নারায়ণগঞ্জে পৌঁছে যুবক চিন্তায় পড়লো – ঢাকায় এই প্রথম চলেছে, ঢাকার যা অবস্থা - কি করবে বুঝতে পারছে না। এমন সময়ে তারই সমবয়সী দুটি ছেলে [শান্তিদাস মজুমদার ও ভূপেন রায়] কামরায় উঠলো। নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলছে - প্রায়ই তারা বলছে 'ঠাকুর' আর 'স্বামীবাগ'। যুবক জিজ্ঞেস করে, "কোন্ ঠাকুরের কথা বলছেন

আপনারা?" ওরা উত্তর দেয়, "ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারীর কথা।" অল্পসময়ের মধ্যেই ছেলে দুটির সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। ওদের মধ্যে একজন বললো, "ও, তাহলে আপনার কথাই ঠাকুর সেদিন বলছিলেন।" "কি বলছিলেন?" – যুবক জিজ্ঞেস করে।

- ঠাকুর তখন আলাপ করছিলেন, আলাপের মাঝেই বলে উঠলেন, "আমার এক নতুন শিষ্য গঙ্গাবক্ষে বসে আমার জন্য অঝোরে কাঁদছে রে।" যুবক অবাক হয়ে যায় - তার কান্নাও তবে ঠাকুর শুনতে পান! ['প্রত্যক্ষ অনুভূতি' পাণ্ডুলিপি – বিশ্বপদ দাসগুপ্ত]

কিছুদিনের মধ্যেই ঠাকুর আবার কলকাতা গেলেন। ঠাকুরের ছোট বোন গীতা দেবীর বিবাহ ঠিক হয়েছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আশুতোষ শাস্ত্রীর পুত্র সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। গতবার যখন ঠাকুর কলকাতায় এসেছিলেন, বরপক্ষ মেয়ে দেখে গেছেন এবং দিন ধার্য হয়েছে। ঢাকা থেকে সবাই কলকাতা এসেছেন, শুধু ঠাকুর, কিছুদিনের জন্য ঢাকা গিয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত কলকাতায়ই ছিলেন ঠাকুর, মাঝে এক-দেড় মাসের জন্য ঢাকা যান, আবার ছোট বোনের বিয়ে এবং অন্যান্য কাজের জন্য কলকাতায় আসেন। ঢাকা থেকে আসবার সময় দিদিমা [১৯৪০ সালের কথা। দিদিমা নাতিকে ধরেছেন তাঁর যেন গঙ্গার পাড়ে মৃত্যু হয়। ঠাকুর কথা দিয়েছিলেন যে, তাঁর গঙ্গার পাড়েই মৃত্যু হবে। দিদিমার বয়স প্রায় ৯৬/৯৭ হবে। ঠাকুরের মাতামহ অম্বিকানাথ বিদ্যাভূষণ ঢাকাতে দেহরক্ষা করেন ১৯৪১ সালে। স্নান করে পূজায় বসেছেন - পুত্রবধূ খাবার আয়োজন করেছেন, কিন্তু বৃদ্ধ অম্বিকানাথ পূজাশেষে শেষ প্রণাম করে আর উঠলেন না। (প্রথমপর্ব দ্রষ্টব্য)] রাজলক্ষ্মী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে এলেন।

দিদিমাকে আদর করে অনেক সময় ডাকতেন 'বুড়ী' বলে। বললেন, "চল বুড়ী, তোমাকে কলকাতা নিয়ে যাই, গঙ্গাদর্শন করবে।" দিদিমা তো আনন্দে আত্মহারা, গঙ্গাদর্শন করতে পারবেন কলকাতা গেলে। তবু তাঁর মনে হয়তো একটু সন্দেহ উঁকিঝুঁকি মারছিল – 'বীরু তো কখনও নিয়ে যেতে চায় না, তবে কি আমার শেষ সময় উপস্থিত? বীরু তো বলেছিল যে, আমার গঙ্গার পাড়ে মরবার আকাঙ্খা সে পূর্ণ করবে।' তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এই আমার শেষ

সময় নাকি রে?" ঠাকুর কোন জবাব না দিয়ে বললেন, "যেতে না চাও তো থাক।" একে গঙ্গাদর্শন হবে, তারপর তাঁর প্রিয় নাতির সঙ্গে যাবেন – দিদিমা আর দ্বিরুক্তি করেন না, তৈরী হয়ে নে'ন। দিদিমার এই নাতিটির উপর অগাধ বিশ্বাস, তিনি বলতেন, "বীরু, তুই একটু দৃষ্টি দে, তাহলেই সব ভরে যাবে।" ঠাকুরের মাও বলেন, "তোর লক্ষ্মীর সংসার, যেখানে যাস, ভরে ওঠে।" ওঁরা সবাই দেখেছেন, ঠাকুর যেখানেই যান না কেন - তিনি একটু মন দিলেই সব ভরে যায়, কোন অভাব থাকে না। কি করে, কোথা থেকে আসে বোঝা শক্ত, অথচ ঠিকই এসে যাচ্ছে। প্রণামীর টাকা তিনি ধরেন ও না, অথচ কোনটারই অভাব নেই। সেই নাতির সঙ্গে দিদিমা কলকাতা যাবেন, তাঁর আর কি আপত্তি থাকতে পারে! দিদিমার জন্য ফার্ষ্টক্লাস টিকিট করেছেন। ষ্টীমারে একা একটা ঘরে - সন্ধ্যা-পূজা করবার কোন অসুবিধা নেই - ঠাকুর দিদিমার জন্য জল এনে দিয়েছেন। দিদিমা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "আরে, ষ্টীমারটা তো একেবারে খালি! আমরা ছাড়া আর যাত্রী নেই বুঝি?" দিদিমা বুঝতে পারেন নি যে, তিনি ফার্ষ্টক্লাস কেবিনে যাচ্ছেন। ঠাকুর দিদিমাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে দেখালেন থার্ডক্লাসে মানুষের ভিড়। দিদিমা এবার বুঝতে পারলেন। ঠাকুর দিদিমাকে নিয়ে কলকাতায় নিমতলার বাড়িতে উঠলেন। ইদানীং কলকাতা এলে নিমতলার বাড়িতেই ওঠেন। এদিকে ঠাকুরের ছোটবোন গীতা চক্রবর্তীর বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে। সেদিকে যোগাড়যন্ত্র চলছে। কয়েকদিনের মধ্যেই দিদিমা রাজলক্ষ্মী দেবী অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং সেই অসুস্থতাই শেষ পর্যন্ত কাল হয়ে দাঁড়াল। বেশিদিন ভুগতে হ'ল না – সবার সেবা যত্ন গ্রহণ করে দিদিমা দেহরক্ষা করলেন গঙ্গার পারে। নিমতলা শ্মশানে দিদিমার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হ'ল। পুত্র হেরম্বনাথ মায়ের মৃত্যুর খবর জানতেন না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে কলকাতা এসেছেন সেইদিনই। বাড়িতে পৌঁছেই শুনলেন মায়ের মৃত্যুর খবর। সোজা চলে গেলেন নিমতলা শ্মশান ঘাটে যেখানে তাঁর মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলছে। ওই অবস্থাতেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মুখাগ্নি করলেন। [দিদিমার মৃত্যু – ৫ই ফাল্গুন, ১৩৫৩

গীতা চক্রবর্তীর বিবাহ – ১১ই ফাল্গুন, ১৩৫৩(২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭)]

একদিন নিমতলার বাড়িতে কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে মন্ত্র সমন্ধে আলাপ করছিলেন। - মন্ত্রের যে শব্দ, তার শক্তি নির্ভর করে গুরুর শক্তির উপর - যে কোন শব্দই মন্ত্ররূপে ব্যবহার করা যায়, ভিন্ন ভিন্ন মনের চাহিদা অনুযায়ী গুরু ভিন্ন ভিন্ন শব্দ দেন - মন্ত্রের ক্ষমতা গুরুর শক্তির উপর নির্ভর করে আর গুরু হতে পারেন তিনিই, যিনি জন্ম থেকেই বিশ্ববিরাটের সুর নিয়ে আসেন....বলতে বলতে হঠাৎ ঠাকুর উঠে গিয়ে বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। ভক্তেরাও উঠে এসেছে সঙ্গে সঙ্গে, ঠাকুরকে ওখানে বসে পড়তে দেখে তারা জিজ্ঞাসা করলো, "কি দেখছো, ঠাকুর?" ঠাকুর বললেন, "উজানচর থেকে আমার এক ভক্ত এসেছে। সে বাড়িটা খুঁজে বেড়াচ্ছে, পাচ্ছে না। তাই উঠে এসে এখানে বসলাম।" [ঠাকুর অনেক সময়েই, কারও অপেক্ষা না রেখে, নিজেই নিজের কাজ করে নে'ন। তাই যখন বুঝতে পারলেন যে, উজানচর থেকে লোক এসেছে এবং তাঁর বাড়ির খোঁজ করছে, তিনি কাউকে আদেশ না করে নিজেই গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালেন। কে কখন কোথা থেকে আসছে, কে কোথায় কি করেছে, সবই তাঁর মনের সচ্ছদপর্ণে ধরা পড়ে।] ভক্তরা বললো, "তুমি বসবে কেন? আমরা বসছি। কি রকম দেখতে বল।" ঠাকুর বললেন, "মাঝ বয়সী একটি লোক, গায়ে একটা ফতুয়া, পরনে আধময়লা কাপড়। উজানচর স্কুলের দপ্তরী।"

ঠাকুর ভিতরে গিয়ে বসলেন। ভক্তেরা রাস্তায় গিয়ে আগন্তুকের প্রতীক্ষা করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে লোকটি এসে চারিদিকে খুঁজছে মনে হ'ল। একজন তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি ঠাকুরকে খুঁজছেন?" সে বললো, "হ্যাঁ, এই ঠিকানা।"

-চলুন, ঠাকুর আপনাকে ডাকছেন।

আগন্তুক ভক্তটির সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল, সে সেই প্রথম কলকাতা আসছে। উজানচর থেকে রওনা হবার সময় ঠাকুরের ঠিকানা নিয়ে এসেছে। হঠাৎ আসার ঠিক হয়েছে, তাই জানিয়েও আসতে পারে নি। সারা রাস্তা সে জিজ্ঞেস করতে করতে এসেছে। বাড়ির কাছাকাছি এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেকক্ষণ, কিছুতেই বাড়ি ঠিক করতে পারছিল না। 'ঠাকুর ডাকছেন' শুনে, সে অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে গেল - একে তো সে সাধারণ একজন দপ্তরী, তার উপর ঠাকুরকে সে

জানায়ও নি যে সে কলকাতা আসছে, সুতরাং সে অবাক হয়ে ভক্তদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো আর চিন্তা করতে লাগলো, 'কি করে ঠাকুর তার আসার কথা জানতে পারলেন? এর চেয়ে অলৌকিক আর কি হতে পারে?'

১৯৪৭ সাল - ভারত বিভাগ প্রায় ঠিক। সবার মনে প্রশ্ন – বাংলাদেশ ভাগ হয়ে কি অবস্থা দাঁড়াবে? সরকারী চাকুরী যারা করে তাদের কাছে, কোন বাংলায় কাজ করতে চায় তার সিদ্ধান্ত জানতে চাওয়া হয়েছে। ঢাকার হিন্দু পল্লীতে ঘন ঘন মিটিং হচ্ছে – অতঃপর কি কর্তব্য। স্বামীবাগে সব গণ্যমান্য ব্যক্তি মিলে একটা মিটিং ডাকলেন। ঠিক হ'ল বালক ঠাকুরের মতামত নেওয়া হোক। সুতরাং বালক ঠাকুরও সেখানে উপস্থিত হলেন। পিতৃপিতামহের ভিটা ছেড়ে কেউই সহজে যেতে চায় না। পূর্ববঙ্গবাসীদের কাছে, কিছু দিন কলকাতা গিয়ে ঘুরে আসাটা মন্দ লাগে না, কিন্তু দেশ ছেড়ে, মাতৃভূমি ছেড়ে সেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা অকল্পনীয়। অবশ্য চাকরীর খাতিরে অনেককে দেশ ছেড়ে শহরে গিয়ে বাস করতে হচ্ছে - তাদের কথা আলাদা। যাই হোক, মিটিং-এ অনেকে অনেকরকম মত প্রকাশ করলেন। কেউ বললেন - আমরা যদি সংঘবদ্ধভাবে কয়েকটি এলাকা বেছে নিয়ে থাকি, তবে আর কোন ভয় থাকবে না। কেউ বললেন - এই পাকিস্তান আন্দোলন বেশিদিন টিকবে না। আবার সব এক হয়ে যাবে, সুতরাং তড়িঘড়ি কিছু করবার প্রয়োজন নেই। আবার অনেকে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে যাওয়ার পক্ষপাতী - তবে কিছুদিন দেখে যেতে চান। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল – তিনি কি বলেন। ঠাকুর বললেন যে, এদেশে আর কিছুতেই থাকা চলবে না। একবার মুসলমান রাষ্ট্র হয়ে গেলে ওরা হিন্দুদের উপস্থিতি কোনমতেই বরদাস্ত করবে না। যাঁরা ভাবছেন যে, একতাবদ্ধ থাকলে কোন ভয়ের কারণ নেই, তাঁরা ঠিক অবস্থাটা কল্পনা করতে পারছেন না। দেশ বিভাগ হয়ে গেলে, ওদের সরকার, ওদের পুলিশ, ওদের মিলিটারী হবে। সেইরকম মুসলমান রাষ্ট্রে হিন্দুদের একতাবদ্ধ প্রতিবাদের কোন দাম থাকবে বলে মনে হয় না। সুতরাং তাঁর মতে সময় থাকতে এদেশ ছেড়ে যাওয়াই ভাল। চলে গেলেই বরং সৌহার্দ্য বজায় থাকবে, থাকলে শুধু তিক্ততা বাড়বে। ইতিমধ্যে ঠাকুর একজন মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে বাড়ি এক্সচেঞ্জ করে ফেললেন এবং যা যা আছে সব গুটিয়ে নিয়ে বা বিক্রী করে কলকাতা চলে যাওয়া

স্থির করলেন। ঠাকুর সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন শুনে অনেকেই দ্বিতীয়বার চিন্তা না করে সম্পত্তি বিক্রী করে চলে যাবার মনস্থ করলেন। কিছু লোক অবশ্য 'আর কিছুদিন দেখা যাক', ভেবে পূর্ববঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। [যাঁদের পূর্ববঙ্গ বা পাকিস্তান ছেড়ে চলে আসার উপায় ছিল না, তাঁদের কথা আলাদা - কিন্তু উপায় থাকা সত্বেও যাঁরা পাকিস্তানে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাঁদের অনেককেই অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

ঠাকুর ঢাকা ছেড়ে চলে এসে নিমতলা ষ্ট্রীটের বাড়িতে উঠলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে সব ভাইয়েরা মিলে শ্যামবাজার ভূপেন্দ্র বোস এভেনিউ-তে একটি জরাজীর্ণবাড়ি কিনে সংস্কার করতে শুরু করলেন।]

ঠাকুর ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন – লোকের মুখে মুখে কথাটি বেশ ছড়িয়ে গেছে। ঠাকুরের চলে যাবার সিদ্ধান্তের কথা শুনে যারা পার্টিশনের পর ঢাকাতেই থেকে যাবে ঠিক করেছিল, তাদেরও অনেকেই যাবার সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করলো। ঠাকুর এবার ঢাকা ছেড়ে চলে গেলে কোথায় কবে তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই, তাই দর্শনার্থীর ভিড় ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে - বহু লোক দীক্ষা নিচ্ছে। সেদিন বহু লোক এসেছে - কেউ বলছে, 'ঠাকুর আমার অসুখটা সারিয়ে দেও', কেউ বলছে, 'ঠাকুর শান্তি যেন পাই', কেউ বলছে, 'বিপদ থেকে যেন মুক্ত থাকতে পারি।' ঠাকুর মাঝে মাঝে আলাপ করছেন, "সবাই একটা জিনিসই জীবনে চায় – সেটা হচ্ছে শান্তি। রোগ থেকে মুক্তি, বিপদ থেকে মুক্তি। সুস্থ শরীর, ভাল চাকরী, অর্থের সচ্ছলতা - যাই চাও না কেন, উদ্দেশ্য একটাই – শান্তির কামনা। শান্তি যেভাবে কায়মনোবাক্যে চাও, ভগবদ্‌দর্শন কি সেইরকম চাও, তার জন্য সেই রকম আকুলতা আসে কি? যদি বল সুপ্ত কামনা থাকে, সেটা ঠিক মেনে নেওয়া যায় না - কারণ শান্তির জন্য যে রকম ব্যাকুলতা আসে, ভগবদ্‌দর্শনের জন্য সে রকম ব্যাকুলতা কোথায়? কোন ইন্দ্রিয় তোমার ভগবদ্‌দর্শন খোঁজে - চিন্তা করে দেখ। তার কারণ ভগবান আছেন কি নেই, সঠিক ভাবে তার মীমাংসা আজও হয়নি। সুতরাং কার উপর নির্ভর করে ব্যাকুলতা আসবে? একটা জিনিস শুধু দেখা যাচ্ছে – সেটা হচ্ছে মহাশূন্য। সেই ফাঁকা থেকেই সৃষ্টি, ফাঁকাতেই লয়।.....

ফাঁকা থেকেই সৃষ্টি, ফাঁকাতেই লয়। ফাঁকাই অনন্ত চৈতন্যের আধার। কথাটা শুনতে একটু আশ্চর্য মনে হয়, না? ফাঁকা তো ফাঁকাই। ফাঁকা আবার কেমন করে চেতন হয়? এ প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক প্রশ্নের উত্তরে স্বাভাবিকভাবেই বলতে হচ্ছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু তোমাদের দৃষ্টিতে আসছে, অনন্ত মহাকাশের গ্রহনক্ষত্ররাজি সব কিছুই কিন্তু ফাঁকাকে আশ্রয় করে রয়েছে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সবই শূন্যপথে নিজ নিজ কক্ষে আবর্তিত হয়ে চলেছে। তুমি তো শূন্যের সমুদ্রে ভাসছো। এ কথা অস্বীকার করবে কি করে? প্রকৃতির প্রতিটি বিষয়ই জ্ঞানসম্মত। প্রতিটি বস্তুই তার সমস্ত গুণাগুণ আহরণ করছে শূন্য থেকে, ফাঁকা থেকে। তাহলে ফাঁকা কত বড় সচেতন, বলতো ?

যতরকম ওষুধ আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে তৈরী হয়েছে বা আবিষ্কৃত হয়েছে বলে মনে করছো, সব কিন্তু মাটি থেকেই উদ্ভুত। মাটির থেকেই জন্ম নিয়েছে উদ্ভিদ, গাছ-গাছড়া। সেই সব গাছ-গাছড়া থেকেই ওষুধ তৈরী হচ্ছে। তাহলে মাটির মধ্যে সমস্ত ওষুধের গুণাবলী রয়েছে বলা যায়। মাটির সেই গুণই - বিভিন্ন বস্তুতে, বিভিন্ন ধারায় প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এই প্রকাশ করার ফলে - বিচক্ষণেরা, বিশারদেরা জীবজন্তু থেকে, বিশেষ বিশেষ বস্তু থেকে, গুণাবলী সংগ্রহ করে, কোন্ কোন্ ব্যাধিতে সেটা প্রযোজ্য জেনে নিয়ে, সেইসব বিশেষ বস্তুগুলিকে বিশেষ বিশেষ কাজে লাগিয়েছে। সবকিছু গুণের মূলে হচ্ছে জল, মাটি, আলো অর্থাৎ তেজ। এরা পরস্পর পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে। জল ছাড়া মাটি নয়, মাটি ছাড়া জল নয়। এই যে মিশ্রণ - মিশে আছে, মিশ্রিত হয়ে আছে, এরাই - যাকে জীবন বলে, প্রাণ বলে, সেই প্রাণকে, প্রাণশক্তিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তোমাদের দর্শন, স্পর্শন, অনুভূতি আছে, তোমরা উপলব্ধি করছো, করানেওয়ালা করানোর ক্ষমতা দিয়েছে বলেই তো করছো। তোমাতে যা বিদ্যমান, এগুলো সেগুলোতে অর্থাৎ জল, মাটি, আকাশে, বাতাসে প্রতিষ্ঠিত। তাতে আছে বলেই জীবজগতের মাধ্যমে সেগুলি প্রকাশ পাচ্ছে। চৈতন্য বল, প্রাণ বল, ভাষার মাধ্যমে যা কিছু বল, সবই সেই মাটিতে, জলে পরিপূর্ণভাবে রয়েছে। বিভিন্ন ধারায়, বিভিন্ন ভাবে, বহুমুখীতে তাদের সেই সাড়াগুলো কি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হচ্ছে! এই প্রকাশিতের ভঙ্গিমা - ধারার ধারায় কি ইঙ্গিত বহন করছে? এই ইঙ্গিতই যেন পাওয়া যাচ্ছে প্রতিটি

বস্তুর মাধ্যমে - তারা যেন নিজেকে প্রকাশ করে বলছে – জেনে নাও, এই ধারার ধারাপাতা থেকে আমাদের সত্তা, আমাদের পরিচয় চিনে নাও। তোমরা একজন আরেকজনকে যেভাবে বুঝাচ্ছ, জেনে নিচ্ছ - সে আবার তোমাকে বোঝাচ্ছে, জেনে নিচ্ছে – ভাবের এই আদান-প্রদান চলেছে সর্বত্র। তোমার ডাকে একজন সাড়া দিচ্ছে, তোমার ভালবাসায় সাড়া দিচ্ছে - সরাসরি এই সাড়ার বিনিময়, ভালবাসা, প্রেম, অন্তরের বিনিময় চলেছে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভুল ভাঙ্গিয়ে দিলে ভুল বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এবং নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধি, বৃত্তি, বিচার, বিবেচনা প্রতিটি বস্তুতেই রয়েছে। একটি ছোট লতাগাছ যদি অন্ধকার ঘরে রেখে দাও - আর সেই ঘরে যদি ছোট একটি ফুটো থাকে, সেই ফুটোতে আলোর রেখা দেখে, সে আলোর দিকে নজর দিতে দিতে আলোর দিকেই যায়। সে বোঝে, সে আলো চায়, বাঁচতে চায়। কে শেখাল তাকে আলোর দিকে তার গতিপথ চালিত করতে? এই যে বুঝ, এই যে জ্ঞান - এখানকার গ্রন্থের উপর নির্ভর করে না। যে বিরাট গ্রন্থে, যে বিরাট রচনা, যে বিভিন্ন ঘটনাবলীর প্রকাশ জাজ্বল্যমান হয়ে রয়েছে, তা পাঠ করলেই বুঝে নেওয়া যায়। আগেই বলেছি, প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই বুঝ আছে, বাঁচার শক্তি আছে। ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই তা বুঝতে পারা যায়। এই ফাঁকা আকাশে আশ্রয় করে রয়েছে সব বস্তু। ফাঁকাতেই সব বিদ্যমান। ফাঁকা থেকে সৃষ্টি – এ ছাড়া আর কিছু বলার উপায় নেই। ফাঁকার কোন শেষ নাই। এই অনন্ত কোটি গ্রহ নক্ষত্র কোথা থেকে এল? ফাঁকাকে কেন্দ্র করেই তারা এগিয়ে চলেছে। কি বুঝলে? যে বিষয়বস্তুকে আমরা চৈতন্য বলি, সে সবই শূন্যকে আশ্রয় করে আছে। এছাড়া আর কোন পূর্বপরিচয় নেই, কোন হদিশ নেই। কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড? এই অসীম, অনন্ত শূন্য থেকেই কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র আবির্ভূত। তাদের থেকেই প্রাণ, মন, বুদ্ধি, বিবেক এসেছে। তার ইঙ্গিত পাই ক্ষণে ক্ষণে। কোন্ পথে প্রকৃতি আমাদের টানছে? ঠিক কি বোঝাতে চাইছে, আমরা আমাদের বুঝ নিয়েই তা বুঝে নিচ্ছি। শূন্য থেকেই এসেছে আলো, বাতাস, জল, মাটি, এসেছে ভূলোক, জীবজগৎ, এসেছে সবই যা বস্তু বলে অভিহিত। এই বস্তু ফাঁকা থেকেই এসেছে। ফাঁকাই সব কিছুর original (আদি)। 'তোমাদের প্রাণ দিয়েই আমাদের বুঝতে পার, আমাদের সজাগ সচেতনতা বুঝতে পার।' শূন্যই যেন প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুর মাধ্যমে বলছে – 'তোমরা বুঝতে পারছো, আমরা কি সুন্দর গাণিতিক

নিয়মে সাজিয়ে তুলেছি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু?' তোমরা যাকে বিচক্ষণ, বিশেষজ্ঞ বল, তার থেকেও কত কোটি গুণ বিশেষজ্ঞ হলে, বিচক্ষণ হলে প্রয়োজন বোধে বোধে, মাত্রায় মাত্রায়, মাত্রাবোধের মাপকাঠিতে জগৎকে ঢেলে সাজিয়ে তৈরী করা যায়? অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারবে। তোমাদের বুঝে সবইতো বুঝতে পার। খালি পুকুর ভরে গেলে বুঝবে খাল থেকে জল এসেছে। নদীর থেকে জল এসেই খাল ভরে। নদী ভরে গেলে বুঝতে হবে, সাগরের জল পূর্ণ করেছে নদীকে। আবার সাগর যখন পূর্ণ হয়ে যায়, বুঝতে হবে পাহাড়-পর্বতের থেকে, মহাকাশের থেকে নেমে এসেছে বারিধারা। এই আবর্তন-বিবর্তনের মাধ্যমে ভরে তোলার ব্যবস্থা অফুরন্ত ভান্ডার থেকে আসছে। অফুরন্ত ভান্ডার আছে বলেই মনে হ'ল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাণ্ডারের কথা। ক্ষুদ্র ভান্ডার না হলে, ভান্ডার শূন্য না হলে পূর্ণ হওয়ার কথা আসে কি করে? অফুরন্ত ভান্ডার তো সদাই পূর্ণ। তাকে পূর্ণ করার তো আর প্রয়োজন নেই। প্রকৃতি প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে চোখে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে বাস্তব বিষয়-বস্তুর মাধ্যমে। প্রতিমুহূর্তে চলার পথে, জানার পথে আমাদের সচেতন করে দিচ্ছে। তা দিয়েই বুঝতে হবে পূর্বপুরুষের পরিচয়। ছেলে যখন আছে, তার বাবা আছে। তার বাবা, তার বাবা.....এমনি করে পূর্বপুরুষের ধারা তো থাকবেই। এইভাবেই বলা যাবে, যা কিছু বাস্তব, চেতন, সচেতন - প্রকাশ্যমান বস্তু, এদের পূর্বপুরুষ আমরা। আমরা বলবো, 'এই কারণেই আমাদের থেকেই জীবজগতের সৃষ্টি।' এইভাবে বিবেচনার পথে, বিবেচক হয়ে, ধারার ধারা ধরে ধরে এগিয়ে গেলে বলতে হয় - ফাঁকা থেকে, 'কিছু নেই' থেকেই সৃষ্টি। ফাঁকাকে আশ্রয় করেই আবর্তন-বিবর্তনের ধারা চলেছে চিরন্তন। সজাগ শুধু আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই চেতন চৈতন্য রয়েছে মহাকাশের সমস্ত ফাঁকার রাজত্বে শূন্য হয়ে। সমস্ত শূন্যই সজাগ, জাগ্রত। ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। এই ফাঁকার মধ্যেই রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ সবই আছে। বর্ণে বর্ণে কত বৈচিত্র্য - কিন্তু বর্ণনায় আনা যায় না। বর্ণবোধ শুধু আমরা। তোমাদের ধ্যানে জ্ঞানে তাকে আনতে পারছো না। শূন্য চেতন, শূন্য সচেতন। তোমরা সীমাতে যা দেখছো, সীমাবিহীনের ধারাই তার ধারা। সুতরাং কাকে বলবো? তোমার ধ্যানধারণা, সুরসাধনার পথে অন্তরায় কোথায়? নিজেরা জেনে নাও। সবাই ঐ শূন্যকে আশ্রয় করেই আছে।

প্রশ্ন – ঠাকুর, আমরা যেমন একজনকে ডাকলে সে সাড়া দেয়, ফাঁকা যখন সজাগ এবং সচেতন, মনে-প্রাণে যদি ডাকি, আমাদের ডাকে সাড়া দেবে কি? এই সাড়া সর্বত্র – ভাবতে অসুবিধা কোথায়?

উত্তর – কথা ঠিকই বলেছো। তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না কেন? খনিতে সোনা আছে। সেই সোনা তো সাথে সাথে পরা যায় না। সোনা দিয়ে অলঙ্কার তৈরী করে পরতে হয়। যে সাড়ার কথা বললে, চেতনার বিরাট খনিতে তাকে হঠাৎ ডাকলে সে সাড়া দেবে কি না, এই প্রশ্ন যদি ওঠে - সে যাতে সাড়া দেয়, তোমরা তার সাড়া পাও, তার জন্য রয়েছে ব্যবস্থামূলক পথঘাট। সেইভাবেই এই ধারাপাতার রচনা। কিভাবে, কোন্ পথ অবলম্বন করলে সুরের সাড়া পেতে পার, তার পথঘাট এমন সুন্দর করে সাজানো রয়েছে যে, পাওয়ার পক্ষে কোন অসুবিধা নেই। এখন তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ফাঁকা জায়গা থেকে খেতে চাও, তাতো পাবে না। ফাঁকাই জানিয়ে দিচ্ছে, খেতে হলে এই নিয়মাবলীর মাধ্যমে খাবার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। সেই ব্যবস্থাপত্রের ব্যবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করে নিলে, হাত বাড়ালেই খাবার পেয়ে যাবে। শূন্যকে এমনি হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় না। শূন্যেরই বিষয়বস্তু পাবে, যে ধরা দিয়েই আছে। ধরার সেই ধারাবাহিক ধারা ধরে ধরে এগিয়ে যেতে হবে। এগিয়ে গেলেই খুঁজে পাবে সেই সুর, সেই সাড়া। তোমার অন্তরের ডাকের সাথে সেই সাড়া মিলে যাবে একমুহূর্তে। প্রকৃতির বিষয়বস্তুতে সব ব্যবস্থাই রয়েছে তোমাকে সেই সুরে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য। প্রকৃতির চেতনার খনিতে সৃষ্টির মাধ্যমে যা আসছে, আমরা যা পাচ্ছি সীমাবদ্ধে, আমাদের সীমানায়, তাকে অলঙ্কার করে পরতে হবে। অলঙ্কারগুলি পাঠ করতে হবে। তবেই তোমরা অবগত হবে 'আমাকে'। মহাশূন্য বলছে – আমাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বহুরকমভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এখানকার সাড়ায় একজনকে ডাকলে আরেকজন সাড়া দেয়। শূন্যকে ডাকলে সাড়া দেয় কিনা, এ প্রশ্নের উত্তর তখনই পেয়ে যাবে। সুরসাধনায়, সৃষ্টিতত্ত্বের ধারায় এটাই নিয়ম – যত বেশি গভীরে যাবে, তত বেশি গভীর সুরের সাড়া পাবে। যত সাড়া পাবে, ততই তৃপ্ত হয়ে আরও বেশি তৃপ্তির পথে যাবে। প্রকৃতির নিয়মে এমনই সুন্দর স্রোতের টান যে, তোমাকে হাত ধরে ধরে

নিয়ে যাবে। টানে টানে তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে অনন্তের পথে। তুমি হাল ছেড়ো না। হাল ধরে থেকো। তুমি জানতে চেয়েছিলে, প্রাণভরে ডাকলে সাড়া পাবে কি? ঠিকই পাবে। সাড়ার পথে হাল ধরে থাকলে, টেনে নিয়ে যাবে স্রোতের টানে আপন পথ। কোন বাধা নেই। স্বচ্ছ পবিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে সৃষ্টির ধারা। সেখানে আছে অফুরন্ত আনন্দ আর তৃপ্তি। সৃষ্টির মাধ্যমে এই তৃপ্তির নমুনা, তৃপ্তির ইঙ্গিত সর্বদাই পাওয়া যায়। আগেই বলেছি, বাস্তবে যা আছে, জীবজগৎ যা চায়, তার সবকিছুই এসেছে মহাশূন্য থেকে। জীবজগৎ সর্বদাই চায় শান্তি, তৃপ্তি। নানা পরিবেশে বিভিন্ন অবস্থার মাধ্যমে তাকে চলতে হচ্ছে, কিন্তু পরিশেষে প্রতিটি জীবই চায় অনন্ত তৃপ্তি ও শান্তি। তার জন্য কত অক্লান্ত পরিশ্রম, কত ছলচাতুরী, মিথ্যা-প্রবঞ্চনার প্রয়োজন হয়, উদ্দেশ্য কিন্তু একই - তৃপ্তির পথের পথিক হওয়া। যারা ছলচাতুরী অবলম্বন করছে, আদর্শচ্যুত হয়ে কাজ করছে, তারাও চাইছে পরমানন্দ, পরম শান্তি। পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই দেখছো – সমস্ত জীবজগতের পক্ষেই, সুখশান্তি চাওয়াটা তৃষ্ণা পাওয়ার মত অবশ্য প্রয়োজনীয়। সমস্ত জীবজগৎ আজ শান্তির তৃষ্ণায় কাতর। এটা সঠিক কথা। শান্তি নিশ্চয়ই আছে। অনন্ত চৈতন্যে, ফাঁকাতে, পরমানন্দ, পরম শান্তি না থাকলে তৃষ্ণা জাগতো না। এটাই ইউনিভার্সের মূল নীতি - fundamental basis of the universe. এই পৃথিবীতে কেউ যদি এক সেকেণ্ড, এক মিনিটের শান্তি পায়, প্রকৃতি তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে – মুহূর্তেই যদি শান্তি পাও, অফুরন্ত ভান্ডার না থাকলে তাতো পেতে না। এটাই প্রকৃতির গাণিতিক নিয়ম। আমার ভিতরে যে শান্তির ভান্ডার রয়েছে, তার পূর্বাভাস তো ধারার ধারাপাতার প্রতি বস্তুতেই পাচ্ছ। প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুতে, দর্শনে-স্পর্শনে, স্বাদে-সোয়াদে আছে তার ইঙ্গিত। সেই সুরের সাড়ায় হাল ধরে, পরম তৃপ্ত্যার্থে তৃপ্তির টানে এগিয়ে চল। সেই সাড়া, সেই তৃপ্তির ভান্ডার নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে নিজের ভিতরে, বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর ভিতরে। তোমার চোখের সামনেই সব বস্তুর ভিতরে রয়েছে সুরের ভান্ডার। কোন অসুবিধা নেই। যদিও ভুলভ্রান্তি আমারই দেওয়া, তারও প্রয়োজন আছে। ভুলভ্রান্তির বুঝ হলে সংশোধনের পথও খুঁজে পাবে। যে বুঝ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার সুরের সাড়ায় পথিক, এগিয়ে চল। তাই তোমাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে অসীমের সাড়া, অসীমের স্পন্দন রয়েছে সর্ববস্তুতে, সর্বচিন্তাতে। মৃত্যুও তাই - সীমাবদ্ধতার মধ্যে অসীমের সাড়া। এই পরিবর্তনশীল জগতে মৃত্যু এক বিরাট পরিবর্তন। প্রকৃতির গাণিতিক নিয়মে একটা course

যাতে সম্পূর্ণ করে দেওয়া যায়, তারজন্যই এই সীমিত আয়ু। জীবনের এই course তোমাদের সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তাই মৃত্যু তো জীবনের শেষ নয়, আর একটি নতুন ধারায় প্রবেশ মাত্র। এক একজন যে বয়সে মরে, তার পক্ষে সেই বয়সে নিজ নিজ course শেষ করার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রশ্ন – ঠাকুর, তবে কেন অনেকে অকালে মরে? তাদের কি course complete হবে না ?

উত্তর – হবে না কেন? সীমিত আয়ু পর্যন্ত বেঁচে থাকার ক্ষমতা প্রত্যেকেরই আছে। তবে অকালে যারা মারা যায়, কারণগুলো সৃষ্টি হয় বলেই মরে। কে আগে মরলো, কে পরে মরলো – সেটা বড় কথা নয়। এই জীবনের সীমিত আয়ু, সুরের সাড়া পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সৃষ্টিতত্ত্বের গণিতের সীমানায় যে আয়ু দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারমধ্যে যদি কোন কারিকুরী খাটাতে যাও, যদি অকালে নিজের জীবন নষ্ট করে দাও, তাহলে হবে না, হতে পারে না। হাতে রয়েছে প্রচুর অর্থ, সেখানে যদি বিনা চিকিৎসায় কারও মৃত্যু হয়েছে বলা হয়, সেটি হবে অবান্তর কথা। প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডারে প্রাচুর্যের সব ব্যবস্থাই রয়েছে তোমাদের জন্য। সেখানে যদি কোন অঘটন ঘটে, বুঝতে হবে তোমাদের ব্যবহারের ত্রুটিতেই তা ঘটছে। এর জন্য তোমরাই দায়ী। – 'আমি অবাধে সবাইকে দিয়ে গেছি। কারও স্বাধীনতায় আমি হস্তক্ষেপ করিনি। দেওয়ার পথে কোন কার্পণ্য বা ত্রুটি আমার নেই।'

প্রকৃতি সদাই সচেতন (conscious) করে দিচ্ছে। প্রকৃতির অফুরন্ত ভান্ডার থেকে যদি তুমি অপচয় কর - সেটাও তোমার, আবার যদি সদব্যবহার কর, তাও তোমার। মৃত্যু অনিবার্য - সীমিত আয়ু, জেনেই তোমাকে সব কাজ করতে হবে। গাছে ফুল, গাছে ফল। ফল পেকে গেলে ঝরে পড়ে - আবার নতুন করে গাছ হয়। মৃত্যুও তো ঝরে পড়া, আবার নতুন করে সৃষ্টির জন্য। তাই মৃত্যু শেষ নয় – নবজন্মের সূচনা। আয়ু শেষ হলে, তোমার course complete হলে আবার নতুন করে নব অধ্যায়ের সুর রচিত হবে। কিন্তু অকালে ঝরে পড়লে হবে না। যে ফল পক্ক হয়ে ঝরে পড়ে, তার বীজ থেকেই নতুন গাছ হয়। অকালে ফল ঝরে পড়লে হয় কি? হাল ধরে প্রকৃতির

অনন্ত সুরে, অনন্ত স্রোতের টানে এগিয়ে চললে ঠিকই হবে। কোন চিন্তা নেই। কর্মী, সুর সাধনা কর। কর্ম করে যাও। "পূর্ণতার পথে, পূর্ণ হওয়ার সাড়া পাবেই পাবে।"

বিদায়ের দিন এগিয়ে আসছে। সবারই মন ভারাক্রান্ত। আবার কবে কোথায় তাঁর সঙ্গে দেখা হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সেখানে যদি তাঁর দর্শন পাওয়াও যায়, এই পরিবেশ কি আর ফিরে আসবে? সকলের মনেই আতঙ্ক, আশঙ্কা। মনে মনে প্রার্থনা জানায়, - ঠাকুর, আমাদের দূরে ঠেলে ফেলে দিও না, আমরা যেন তোমার চিরসাথী হয়ে থাকতে পারি।.....

- সমাপ্ত -

রাম নারায়ণ রাম

লহ প্রণাম